দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

ইসলামের ইতিহাস আর্কাইভ-২০১৯

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

সূচিপত্র

সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবনী : পর্ব-১ ..... ৪

সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবনী : পর্ব-২ ..... ১০

সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবনী : পর্ব-৩ ..... ১৮

তিন কথার দাওয়াত ও তিন দিনের আমানঃ প্রকৃত নবীওয়ালা ও সাহাবীওয়ালা কাজ/তাবলীগ ২৩

শিক্ষা ব্যবস্থায় এক নজর ৩০

হায়দারাবাদ : ভূলে যাওয়া ইতিহাস ৩৬

সাইফুদ্দিন কুতজ রহ. কি খলিফা ছিলেন? ৪৪

লক্ষ্যহীন জীবন কেবলই এক মরুভূমি.....৫১

সাহাবায়ে কেরাম (রা) দের চট্টগ্রাম সফর এবং বাংলায় ইসলামের আগমন. ৫৩

সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবনী : পর্ব-১

হুদহুদ পাখি

Member

০১-০৮-২০১৯

সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আমরা রাসুল (সঃ) এর প্রিয় ব্যক্তি যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) এর জীবনি নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ্। প্রিয় উপস্থিতি আসুন শুরুতেই জেনে নিই কিভাবে তিনি রাসুল (সঃ) এর প্রিয় ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হলেন। যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) তিনি যখন ছোট ছিলেন, তার বয়স যখন আট বছর তখন তিনি তার মায়ের সাথে নানার বাড়িতে বেড়াতে আসেন।

পথিমধ্যে হঠাৎ কিছু শত্রু বাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করে বসে। এবং তাকে ধরে নিয়ে উকাজের বাজারে গোলাম হিসেবে বিক্রি করে দেই। আর ঘটনা ক্রমে হযরত খাদিজা (রাঃ) এর ভাতিজা হাকিম ইবনে হিজাম উকাজের বাজার হতে বেশ কয়েকটি গোলাম ক্রয় করে আনে। যার মধ্যে যায়েদ ইবনে হারেসাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। হাকিম ইবনে হিজাম যখন উকাজের বাজার হতে মক্কায় ফিরে আসে তখন হযরত খাদিজা (রাঃ) তার সাথে দেখা করতে যায়, তখন হাকিম ইবনে হিজাম (রাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলেন, হে আমার ফুফু আমি আজ উকাজের বাজার হতে বেশ কিছু গোলাম ক্রয় করে এনেছি, এই গোলামদের মধ্যে থেকে আপনার যেটা পছন্দ হবে সেটাই আপনার জন্যে উপহার। হযরত খাদিজা (রাঃ) সব গোলামদের মধ্যে হতে যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) কে বাছাই করলেন। কেনন তাকে দেখতে খুবিই ভদ্র এবং শান্ত মনে হচ্ছিল। অতপর হজরত খাদিজা (রাঃ) যখন হযরত রাসুল (সঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তখন তিনি যায়েদ ইবনে হারেসা কে রাসুল সঃ এর কাছে সোপর্দ করে দিলেন। যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) আট বছরের ছোট বালক তখন রাসুল (সঃ) এর তত্তাবধানে পতিপালিত হতে লাগল।

রাসুল (সঃ) তাকে খুব আদর স্নেহ করে লালন পালন করতে লাগল। অপর দিকে

যায়েদের পরিবার তাদের হারিয়ে যাওয়া সন্তান কে খুব খোজাখুজি করছিলো কিন্তু তারা তাকে কোথাও খুজে পাচ্ছিল না। অতপর হজের মৌসুমে হজ পালনের উদ্দেশ্যে যায়েদের গোত্রের কিছু লোক মক্কায় আগমন করল, তারা যখন মক্কায় আসলো তখন যায়েদের সাথে তাদের সাক্ষাত হয়ে গেলো, যায়েদ তাদের কে চিনলো, তারাও যায়েদ কে চিনলো হজ শেষে তারা বাড়িতে যেয়ে যায়েদের বাবাকে বলল,আপনার সন্তান যায়েদের সন্ধান পেয়েছি, সে মক্কায় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তত্তাবধানে আছে। এই কথা শুনা মাত্রই যায়েদের পিতা হারেসা তার ভাই কা'ব কে নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা দিল তারা তাদের কলিজার টুকরো সন্তান কে মুক্ত করার জন্যে মুক্তিপণ হিসেবে সাথে করে অনেক পরিমাণ টাকা পয়সা নিয়ে নিল।

তারা মক্কায় যেয়ে রাসুল (সঃ) এর সাথে দেখা করলো এবং বলল, হে আব্দুল মোত্তালিবের সন্তান আপনারা হচ্ছেন পবিত্র ভুমির অধিবাসী, আপনারা হচ্ছেন আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী, আপনারা হাজীদের পানি পান করান, অভাবগ্রস্ত দের সাহায্যে করেন, দুশ্চিন্তা গ্রস্তদের চিন্তা মুক্ত করেন, আমরা শুনেছি আমাদের সন্তান আপনার কাছে আমরা তাকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে এসেছি, তাকে মুক্ত করতে যত টাকা লাগে আমরা দিব, আমরা আশা করছি আপনি অনুগ্রহ করে তাকে মুক্ত করে দিবেন, রাসুল (সঃ) তাদের কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের সন্তান কে.? তারা বলল, আপনার গোলাম যায়েদই হচ্ছে আমাদের সন্তান।

রাসুল (সঃ) বললেন ঠিক আছে কোন টাকা পয়সার প্রয়োজন নেই একটি বিষয়ে আগে আমরা একমত হই, সেটা হল আমি তোমাদের সামনে যায়েদ কে ডাকব যায়েদ যদি তোমাদের সাথে চলে যেতে চাই তাহলে নির্দ্বিধায় তোমাদের সাথে তাকে দিয়ে দিব আমার কোন আপত্তি থাকবে না, এবং আমাকে কোন ধরনের মুক্তিপনও দেয়া লাগবে না, আর যায়েদ যদি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে না চাই তাহলে জোর করে তোমরা যায়েদ কে নিয়ে যেতে পারবে না।

তারা বলল, আপনার কথা ঠিক আছে আমরা আপনার সাথে একমত আপনি আমাদের উপর ইনসাফ পূর্ণ ফায়সালা করেছেন আমাদের ব্যাপারে উত্তম ফায়সালা করেছেন। রাসুল (সঃ) যায়েদ কে ডাকলেন এবং আগত ব্যক্তিদের ইংগিত করে

বললেন, এরা কারা? যায়েদ উত্তর দিল একজন হচ্ছেন আমার পিতা, হারেসা ইবনে শুরাবিল আরেকজন হচ্ছেন আমার চাচা কা'ব।

রাসুল (সঃ) বললেন, হে যায়েদ তারা তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে তুমি চাইলে তাদের সাথে চলে যেতে পার আর চাইলে আমার কাছেও থাকতে পার, এ কথা শুনে ছোট যায়েদ নির্ধীদায় বলে উঠল, হে আমার মনিব আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাব না আমি আপনার কাছেই থাকব।

এ কথা শুনে যায়েদের বাবা রাগান্বিত হয়ে উঠল ধবংস তোমার জন্যে হে যায়েদ তুমি তোমার বাবা মায়ের পরিবর্তে এই গোলামের জীবন কে পছন্দ করলে.! তখন যায়েদ বলল হে আমার বাবা আমি আমার এই মনিব কে এত ভালো পেয়েছি যে আমি তার থেকে কখনও আলাদা হব না, আমি তাকে ছেড়ে কোথাও যাব না, আমি সারা জীবন তার সাথেই থাকব।

ছোট যায়েদের এই উত্তর শুনে রাসুল (সঃ) তার হাত ধরে তাকে কাবা প্রাংগনে নিয়ে গেলেন এবং কাবা প্রাংগনের সামনে হাজরে আসওয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে সঝুড়ে ঘোষণা করলেন,ইয়া মা'শারাল কুরাইশীন, হে কুরাইশ সম্প্রদায় তোমরা সাক্ষী থাক আজকে থেকে যায়েদ আমার সন্তান। সে আমার উত্তরাদীকারি হবে আমি তার উত্তরাধিকারী হব। এই দৃশ্যেটি যায়েদের বাবা ও চাচা স্বচক্ষে প্রত্যেক্ষ করল তাদের অন্তর আনন্দে ভরে গেল এবং তারা সন্তুষ্টি চিত্তে যায়েদ কে রেখে বাড়িতে ফিরে গেল। ঐ দিনের পর থেকে লোকেরা যায়েদ কে যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ, মুহাম্মদের পুত্র যায়েদ বলে ঢাকতে লাগল। অতপর ইসলাম যখন পালক পুত্রের প্রথাকে রহিত করল এই আয়াত নাযিল হল, ""ওদোউহুম আবা আকুম"" তোমরা তাদের কে তাদের পিতার নামে ঢাক, তখন থেকে আবারও যায়েদ ইবনে হারেসা ঢাকা হত। যায়েদ ইবনে হারেসা (রঃ) যখন সবকিছুর চেয়ে রাসুল (সঃ) কে বেশি ভালোবেসে ছিলেন, বাবা মা আত্নীয় স্বজন সব কিছুর উপর রাসুল (সঃ) কে প্রাধান্য দিয়েছিলেন সেদিন হয়ত তিনি জানতেন না, তিনি কত বড় সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তখনও তিনি জানতেন না, তিনি যাকে ভালোবেসেছেন, তিনি যাকে সব কিছুর চেয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন,তিনি হচ্ছেন গোটা মানব জাতির সর্দার, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ)।

কে বাস্তবায়ন করবেন এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পুরো পৃথিবীতে আবারও ন্যায় ইনসাফের রাজত্ব কায়েম হবে। সমগ্র পৃথিবী তে আবারও শান্তি ফিরে আসবে, আর তিনিই হবেন পৃথিবীতে রাজত্ব প্রতিষ্টায় প্রথম ভিত্তি প্রস্তর। এই ভাবনা গুলো তখন যায়েদের মনে মোটেও ছিল না, এভাবেই কয়েকবছর অতিবাহিত হয়ে গেল তারপর তার নবি মুহাম্মাদ (সঃ) কে সত্য দ্বীন সহকারে মানব জাতির নিকট রাসুল হিসেব প্রেরণ করলেন। আর যায়েদ (রঃ) হলেন সেই সকল সৌভাগ্যেবান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যারা সর্বপ্রথম রাসুল (সঃ) এর উপর ঈমান এনেছিল। এই সৌভাগ্যের চেয়ে বড় সৌভাগ্য উত্তম সৌভাগ্য আর কি হতে পারে।

হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রঃ) তিনি যেভাবে রাসুল (সঃ) কে ভালোবাসতেন ঠিক তেমনি ভাবে রাসুল (সঃ) ও তাকে ভালোবাসতেন। রাসুল (সঃ) তাকে নিজের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন, তিনি কোথাও গেলে রাসুল (সঃ) তার পথ পানে চেয়ে থাকতেন, তিনি ফিরে এলে তার আগমনে আনন্দিত হতেন, তাকে দেখে খুব খুশি হতেন। যায়েদ (রঃ) এর শাক্ষাতে রাসুল (সঃ) খুবই আনন্দিত হতেন। এমন একটি আনন্দের মুহুর্ত আয়েশা (রঃ) তুলে ধরেছেন, তিনি বলেনঃ যায়েদ ইবনে হারেসা একদিন রাসুল (সঃ) এর সাথে সাক্ষাতের জন্যে মদিনায় আসলেন, রাসুল (সঃ) সেই সময় ঘরের মাঝে বিবস্ত্র অবস্থায় ছিলেন অর্থাৎ রাসুল (সঃ) এর নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত শুধু ডাকা ছিল এমন অবস্থায় যায়েদ এসে দরজায় আওয়াজ দিলেন, রাসুল (সঃ) এই অবস্থায় দরজার দিকে ছুটে গেলেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। আয়েশা (রঃ) বলেন,আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি এই ছাড়া রাসুল সঃ কে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখিনি।

সকল মুসলমান্দের নিকট যায়েদের প্রতি ভালোবাসার বিষয়টি প্রসিদ্ধ ছিল তাই যায়েদ (রঃ) কে হিব্বু রাসুলিল্লা তথা রাসুল (সঃ) এর প্রিয় ব্যক্তি হিসেবে সম্ভোধন করত। অষ্টম হিজরী তে প্রিয় জনের বিচ্ছেদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়া'লা তার রাসুলের পরিক্ষা নিতে চাইলেন, রাসুল সঃ হারেসা ইবনে উমাইল আল আছরি .রঃ কে একটি পত্র দিয়ে বসরার শাসকের নিকট পাঠালেন, ঐ পত্রে বসরার শাসক কে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয় হয়েছিল অতপর ঐ পত্র বাহক যখন জর্ডানে পূর্বে অবস্থিত মুতা নামক স্থানে পৌছলেন, তখন গাসসানের শাসক শুরা বিল ইবনে আমর তাকে বন্ধি করল এবং তাকে শক্ত করে বেধে তার শিরচ্ছেদ করল, এই সংবাদ যখন রাসুল সঃ এর নিকট পৌছল তখন রাসুল সঃ

এর নিকট এটি খুবই কষ্টদায়ক মনে হল কেননা এতি পুর্বে রাসুল সঃ এর বার্তাবাহক কে এভাবে হত্যা করা হয়নি তাই রাসুল (সঃ) মুতার যুদ্ধের জন্যে তিন হাজার একটি বাহিনী গঠন করলেন আর সেই বাহিনীর সেনাপ্রধান হিসেবে রাসুলে প্রিয় ব্যক্তি যায়েদ ইবনে হারেসা (রঃ) কে নিযুক্ত করলেন।

রাসুল সঃ বললেন এই যুদ্ধে যদি যায়েদ ইবনে হারেসা রাঃ আক্রান্ত হয় তারপর জাফর ইবনে আবু তালেব সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করবে,জাফর ইবনে আবু তালেব যদি আক্রান্ত হয় তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করবে, আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহাও যদি আক্রান্ত হয় তাহলে মুসলমানের মধ্যে হতে সবাই পরামর্শ করে একজন কে সেনা প্রদান হিসেবে নিযুক্ত করবে।

যায়েদ ইবেন হারেসা রাঃ মুসলিম বাহিনী কে নিয়ে মুতা অভিমুখে রওনা হলেন, তারা যখন জর্ডানের পূর্ব পাশে অবস্থিত মা'য়ান নামক স্থানে পৌছলেন তখন সংবাদ পেলেন রুম সম্রাট হীরাক্লিয়াস এক লক্ষ যুদ্ধাকে নিয়ে গাসসানের শাসক শুরা বিল আমর কে রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে আসছে এবং তার সাথে আরবের এক লক্ষ্য মুশরিক বাহিনী এসে একত্রিত হয়েছে এবং এই বিশাল বাহিনী মুসলমানের অদুরের ছাউনি ফেলেছে।

মুসলমানরা এই মুহুর্তে কি করবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে দুই দিন অতিবাহিত হয়ে গেল, তাদের মধ্যে হতে কেউ কেউ বলল, আমরা রাসুল সঃ এর কাছে বার্তা পাঠাই তাদের সৈন্য সংখ্যার ব্যাপারে রাসুল সঃ কে অবগত করি দেখি রাসুল সঃ আমাদের কি বলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা বলে উঠলেন, হে আমার জাতি আল্লাহর কসম করে বলছি আমরা কখনোই সংখ্যা, শক্তি এবং আধিক্যর উপর নির্ভর করে যুদ্ধ করি না বরং আমরা এই দ্বীনের জন্যে যুদ্ধ করি দ্বীনকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ করি, সুতরাং তোমরা যার জন্যে বের হয়েছ তার দিকেই ধাবিত হও আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের দুটি কল্যানের মধ্যে হতে যেকোন একটির ওয়াদা করেছেন, হয়ত বিজয় হয়ত শাহাদাত।

মুসলিম বাহিনীর সকলেই বলে উঠল আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা সত্যই বলেছে, মুতা প্রান্তরে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল এক দিকে দুই লক্ষ বাহিনী অপর দিকে মাত্র তিন হাজার কিন্তু স্বল্প সংখ্যক মুসলিম বাহিনী এমন বীরত্বের সাথে কাফেরদের পিছু নিল যে কাফিরদের অন্তর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গেল। রোমানরা হতবাক হয়ে

তাকিয়ে রইল, হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রঃ রাসুলে দেয়া কালিমার ঝান্ডা কে সমুন্নত রাখার জন্যে এমন ভাবে যুদ্ধ করলেন বীরত্বের ইতিহাসে যার কোন উপমা খুজে পাওয়া যায় না। অবশেষে শত শত বর্ষার আগাতে তার শরির ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল তিনি রক্তাক্ত অবস্থাই জমিনে লুটিয়ে পরলেন অতপর জাফর ইবনে আবু তালেব কালেমার ঝান্ডা কে সমুন্নত করলেন, তিনিই বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে তার সাথির সাথে গিয়ে মিলিত হলেন।

অতপর আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা কালেমার ঝান্ডাটিকে ধারণ করলেন, তিনিও সাহসীকতার সাথে যুদ্ধ করতে করতে তার উভয় সাথির সাথে গিয়ে মিলিত হলেন অতপর সাহাবায়ে কেরাম পরামর্শ করে হযরত খালেদ বিন ওয়লিদ রঃ কে সেনাপ্রদান হিসেবে নিযুক্ত করলেন। তিনি ছিলেন নও মুসলিম, তিনি বিচক্ষনতার সাথে মুসলিম বাহিনী কে নিয়ে সরে পরলেন এবং মুসলমানের ধবংষের হাত থেকে রক্ষা করলেন। অতপর রাসুল সঃ এর নিকট যখন মুতার সংবাদ পৌছল তিনি যখন শুনলেন তার নিজের পুত্র সহ তিনজন সেনাপতিই শহিদ হয়েছে তখন তিনি খুবই দুঃখিত হলেন। তার এই দুঃখ পূর্বের সকল দুঃখকে ছাড়িয়ে গেল।

রাসুল সঃ যায়েদের পরিবার কে সান্ত্বনা দিতে গেলেন, বাড়িতে যাওয়া মাত্রই যায়েদের ছোট মেয়েটি রাসুল সঃ কে জড়িয়ে ধরে কাদতে লাগল। তখন রাসুল সঃ ও কান্না থামিয়ে রাখতে পারলেন না। রাসুল সঃ স্বশব্দে কেদে ফেললেন সাদ ইবনে ওবাদা রঃ রাসুল সঃ কে বললেন, ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনিও ক্রন্দন করছেন, রাসুল সঃ বললেন, এটা প্রিয় জনের বিরহে প্রিয়জনের কান্না, এটা আল্লাহ তা'য়ালা যায়েদ ইবনে হারেসা রঃ এর উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। তিনিও আল্লাহ তা'য়ালার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন।

সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবনী : পর্ব-২

“হযরত সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী (রা)”

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লিআলা রসুলিহিল কারীম আম্মাবাদ।

সম্মনিত উপস্থিতি, আজকে আমরা বিশিষ্ট সাহাবী সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী (রাঃ) এর জীবনী নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় উপস্থিতি, সাঈদ ইবনে আমের সে ছিল ঐ সকল হাজারো মানুষদের মধ্য থেকে একজন। যারা কুরাইশদের ডাকে সারা দিয়ে খুবাইব (রাঃ) হত্যার দৃশ্যকে দেখার জন্য মক্কার অদুরে তানাঈম প্রান্তরে একত্রিত হয়েছিল। হযরত খুবাইব (রাঃ) তিনি ছিলেন রাসুল (সাঃ) একজন প্রিয় সাহাবী। তাকে মক্কার মুশরিকরা প্রতারনার আশ্রয় নিয়ে বন্দী করেছিলো। এবং তাকে হত্যা করে বদরের যুদ্ধে নিহত কুরাইশদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার সংকল্প করেছিলো। মক্কার মুশরিকরা খুবাইব (রাঃ) বন্দী করে তাকে টেনে হেচরে তানাঈম প্রান্তরে দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। আর পিছন দিক থেকে যুবক -যুবতী, নারী ও বৃদ্ধরা করতালি দিয়ে উল্লাশ করছিলো। এবং শ্লোগানে শ্লোগানে লাত উজ্জার জয়ধ্বনি উচ্চারিত করছিলো।

খুবাইব (রাঃ)কে যখন হত্যার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে আসা হলো। তিনি যখন শূলী কাষ্ঠের সামনে দারিয়ে আছেন। তখন সাঈদ ইবনে আমেরের অনুসন্ধানী দৃস্টি খুবাইব (রাঃ) দিকে নিবদ্ধ হলো। তিনি দেখলেন খুবাইব (রাঃ) সেই কঠিন মূহুর্তেও নিঃচিন্তে দারিয়ে আছেন। তার চেহারায় বিন্দু পরিমানও আতঙ্কের ছাপ নেই। নারী শিশুদের শোরগোলের মাঝে সাঈদ ইবনে আমের হঠাৎ করে হযরত খুবাইব (রাঃ)র প্রশান্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন মৃত্যুর আগ মূহুর্তে তিনি কুরআইশ নেতৃবৃন্দদের লক্ষ্য করে বলছিলেন, তোমরা যদি আমাকে দুরাকাত নামাজ পরার সুযোগ দিতে। মুশরিকরা তাকে দুরাকাত নামাজ পরার সুযোগ দিলো।

সাঈদ ইবনে আমের (রাঃ) খুবাইব (রাঃ) দিকে তাকিয়ে রইলেন, তিনি দেখলেন সে কাবার দিকে ফিরে দুরাকাত নামাজ আদায় করল। কতই না সুন্দর ছিলো সেই নামাজ কতই না সুন্দর ছিলো সেই মনোরম দৃশ্য। অতঃপর নামাজ শেষ করে তিনি কুরআইশ নেত্ববৃন্দের দিকে ফিরলেন।এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন। তোমরা

যদি এই ধারনা না করতে যে আমি মৃত্যুর ভয়ে নামাজকে দীর্ঘায়িত করছি। তাহলে আমি আমার নামাজকে আরো দীর্ঘয়িত করতাম। আমি আরো দীর্ঘাসময় নিয়ে নামাজ আদায় করতাম।

অতঃপর সাঈদ ইবনে আমের (রাঃ) স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন, যে মক্কার মুশরিকরা দাড়ালো অস্ত্র দিয়ে খুবাইব (রাঃ) এক একটি অঙ্গকে কর্তন করছিলো। আর বলছিলো তুমি কি চাও তোমার স্থানে মুহাম্মদকে রাখা হবে আর তুমি নিরাপধে পরিবারের নিকট ফিরে যাবে। সাঈদ ইবনে আমের (রাঃ) লক্ষ্য করলেন রক্তাত্ব খুবায়ের অতান্ত্য দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, অতন্ত্য অবিচল কণ্ঠে বলে উঠলেন। আমি নিরাপদে আমার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যাবো আর মুহাম্মদ (সাঃ) এর পায়ে একটি মাত্র কাটা বিদ্ধ হবে আমি এটাও বরদাস্ত করতে পারবো না। এই জবাব শুনা মাত্রই মক্কার কাফিররা অট্ট হাসিতে ফেটে পরল এবং তারা চিৎকার করে বলতে লাগল তাকে হত্যা করো, তাকে হত্যা করো, তাকে শূলীতে চরাও।

খুবাইব (রাঃ)কে শূলে চরানো হলো শূলীবিদ্ধ খুবায়েব আকাশের দিকে চিৎকার দিয়ে বললেন, ""আল্লাহুম্মা আহসিহিম আদাদা ওয়াকতুলহুম বাদাদা ওয়াল তুগাদিরমিনহুম আহাদা""। হে আল্লাহ আপনার কাছে বিচার দিচ্ছি আপনি এদের সংখ্যাগুলোকে গুনে রাখুন। এদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করুন। আপনি এদের কাউকে ছারবেন না। অবশেষে অসংখ্যা তীর তরবারীর আগাতে খুবাইব (রাঃ) দেহটি ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে গেল। তার পবিত্র আত্মাটি আকাশে দিকে উরে গেল। আর তার নিষ্প্রাণ দেহটি জমিনেই পরে রইল।

কুরাইশরা মক্কায় ফিরে এলো। কালের আবর্তে খুবাইব (রাঃ)র শাহাদাতের বিস্ময়কর ঘটনাটি সবাই ভুলে গেল। কিন্তু সাঈদ ইবনে আমর এক মুহূর্তের জন্যও খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদতের সেই মর্মান্তিক দৃশ্যটি ভুলতে পারল না। তিনি যখন ঘুমাতেন তখন স্বপ্নের মাঝেও তার সামনে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদাতের সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্যটি ভেসে উঠতো। জাগ্রত অবস্থাতেও তার স্মৃতিপটে বারবার সেই দৃশ্যটি ভেসে বেড়াতো । খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর কথা মনে পড়লেই তিনি স্থির থাকতে পারতেন না।

সাঈদ ইবনে আমের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু চিন্তা করতেন মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও কিভাবে একজন মানুষ এত সুন্দর করে নামাজ আদায় করতে পারে। সাঈদ ইবনে আমেরের কর্ণকুহরে খুবাইবের বদ দোয়ার সেই শব্দগুলো বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল তিনি ভাবছিলেন কখন জানি আসমানী আযাব এসে মক্কা নগরীকে গ্রাস করে নেয়। কখন জানি আকাশ থেকে বিশাল প্রস্তর খন্ড নিক্ষেপ করে মক্কা নগরীকে ধুলিস্যাৎ করে দেওয়া হয়। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সাঈদ ইবনে আমের কে এমন কিছু বিষয় শিক্ষা দিয়ে গেলেন যা তিনি ইতিপূর্বে জানতেন না। তিনি তাকে শিক্ষা দিয়ে গেলেন প্রকৃত জীবন হচ্ছে তাওহীদের আকীদার উপর অটল থেকে আল্লাহর রাস্তায় জীবন বিসর্জন দেয়া। তিনি আরো শিক্ষা দিলেন যে মানুষের ঈমান যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন তার থেকে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রকাশ পায়। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাঈদ ইবনে আমের কে আরেকটি বিষয় শিক্ষা দিয়ে গেলেন। যেই মানুষটি কে তার সাথীরা এতো ভালবাসে, যেই মানুষটির জন্য তার সাথীরা হাসিমুখে জীবন বিলিয়ে দেয়। নিশ্চয়ই তিনি আসমানী সাহায্যপ্রাপ্ত নবী।

অতঃপর সাঈদ ইবনে আমেরের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিলেন। তিনি সকল মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে কুরাইশের পাপাচার থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করলেন এবং তারা যে সকল বাতিল ইলাহের ইবাদত করে তাদের থেকেও সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। এবং তিনি সকলের সামনে সুউচ্চ কণ্ঠে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। সাঈদ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু প্রিয় রাসুলের সান্নিধ্য লাভের জন্য হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন। মদিনায় যেয়ে তিনি সব সময় রাসুল সাঃ এর পাশেই থাকতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তিনি খাইবারের যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে সকল যুদ্ধে তিনি রাসুল সাল্লাহু সাল্লাম এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর সন্তুষ্ট অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। পরবর্তীতে আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর খিলাফতের সময় তিনি ইসলামের উন্মুক্ত তরবারী হয়ে যান।

সাঈদ ইবনে আমের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তিনি ছিলেন প্রকৃত মুমিনদের এক অনন্য উপমা। তিনি দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রধান্য দিয়েছিলেন। দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাতকে ক্রয় করেছিলেন। খলীফাতুল মুসলিমীন আবু বকর ও ওমর

রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার তাকওয়া ও পরহেজগারীতার ব্যাপারে ভাল করেই অবগত ছিলেন। তাই তারা সাঈদ ইবনে আমের এর উপদেশ ও দিকনির্দেশনাকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে দেখতেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর খেলাফতের শুরুর দিকে সাঈদ ইবনে আমর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কাছে গেলেন। এবং তাকে লক্ষ্য করে বললেন। হে উমর শুনে রাখ তুমি তোমার জনসাধারণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহর ব্যাপারে কাউকে ভয় করবে না। মনে রাখবে তোমার কথা যাতে তোমার কাজের বিপরীত না হয়। কেননা সর্বোত্তম কথাই সেটা যেটাকে কাজে পরিণত করা হয়। হে উমর তুমি দূরবর্তী ও নিকটবর্তী সকল মুসলমানদের প্রতি খেয়াল রাখবে। তুমি তাদের জন্য তাই পছন্দ করবে যা তুমি তোমার নিজের জন্য ও পরিবারের জন্য পছন্দ করো। এবং তাদের জন্য ঐ সকল জিনিসকে অপছন্দ করবে যা তুমি নিজের জন্য ও তোমার পরিবারের জন্য অপছন্দ করো। তুমি সত্য জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভয় করবে না।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন হে সাঈদ? এটা কে করতে পারে। সাঈদ ইবনে আমের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন। হে উমর তুমি পারবে, এবং তোমার মত আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মার শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছেন তারাই পারবে। ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবার সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন হে সাঈদ আমি তোমাকে হিমসের গভর্নর নিযুক্ত করতে চাই? তখন তিনি বললেন হে উমর আল্লাহর কসম করে বলছি তুমি আমাকে পরীক্ষায় ফেলো না। এ কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একটু রাগান্বিত হলেন, এবং বললেন এটা কেমন কথা তোমরা আমার মাথায় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিবে। আর তোমরা দূরে সরে থাকবে। আল্লাহর কসম এবার আমি তোমাকে ছাড়ছি না অতঃপর তাকে হিমসের গভর্নর নিযুক্ত করা হলো। এবং তাকে বলা হলো আমি কি তোমার জন্য রাষ্ট্রীয় ভাতার ব্যবস্থা করব। সাঈদ ইবনে আমের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন আমি রাষ্ট্রীয় ভাতা দিয়ে কি করবো। যদি আমাকে ভাতা দেওয়া হয় তাহলে এটা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি হিমসের চলে গেলেন কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর হিমস নগরী থেকে একটি বিশ্বস্ত প্রতিনিধি দল মদিনায় আসলো।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন তোমরা আমাকে তোমাদের নগরীর দরিদ্র লোকদের একটি তালিকা তৈরি করে দাও। যাতে করে আমি তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারি। অতঃপর তারা একটি তালিকা তৈরি করে দিল। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যখন সেই তালিকাটি তে চোখ বুলাচ্ছিলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন কয়েকটি নাম এর পরের নামটি হচ্ছে সাঈদ ইবনে আমের। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন কে এই সাঈদ ইবনে আমের। তখন তারা বলল উনিই হচ্ছেন আমাদের আমির। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদেরকে বললেন তোমাদের আমির ও কি দরিদ্র। প্রতিনিধিদলটি বলল আল্লাহর কসম করে বলছি কখনো দিনের পর দিন এমন অতিবাহিত হয় যে তার চুলায় আগুন পর্যন্ত জ্বলে না।

এ কথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। এমন কি চোখের পানিতে দাড়ি ভিজে গেল। তিনি ১০০০ দিনার একটি থলে তাদের হাতে দিয়ে বললেন সাঈদ ইবনে আমের এর নিকট আমার সালাম পৌঁছাবে তাকে বলবে ওমর ইবনে খাত্তাব এগুলো আপনাকে আপনার প্রয়োজন পূরণের জন্য দিয়েছেন। প্রতিনিধিদলটি সাঈদ ইবনে আমেরের বাড়িতে এলো এবং তাকে আমিরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে সালাম দিয়ে বলল। আমিরুল মোমেনীন আপনার প্রয়োজন পূরণের জন্য এই দিনারগুলো পাঠিয়েছেন।

সাঈদ ইবনে আমের দিনারের থলিটি দেখামাত্রই বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলেন ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সাঈদ ইবনে আমেরের ভয়ার্ত কণ্ঠ শুনে স্ত্রী দৌড়ে ছুটে এলেন এবং আশ্চর্যনিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। কি হয়েছে আমীরুল মুমিনীন কি ইন্তেকাল করেছেন। সাঈদ ইবনে আমের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন না। বরং এর চেয়ে ভয়াবহ কিছু ঘটেছে। তার স্ত্রী বললেন তাহলে কি মুসলিম বাহিনী কোথাও পরাজিত হয়েছে, সাঈদ ইবনে আমের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন না বরং তার চেয়েও বেশি ভয়াবহ। তার স্ত্রী বললেন তাহলে বলোনা কি হয়েছে? সাঈদ ইবনে আমের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন আমার আখেরাতকে ধ্বংস করার জন্য দুনিয়া আমার উপর চেপে বসেছে আর ফেতনা আমার ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছে। তার স্ত্রী তখনও দীনার সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তার স্ত্রী বললেন ফেতনাকে দূরে সরিয়ে দিন। নিজেও তা থেকে বেঁচে থাকুন। সাঈদ ইবনে আমের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন

তুমি কি এই ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করবে। তিনি বললেন হাঁ অবশ্যই করবো। তারপর সাঈদ ইবনে আমের দিনার গুলো কে ভাগ করে অনেকগুলো থলেতে ভরলেন এবং হিমসের দরিদ্র মুসলমানদের মাঝে তা বন্টন করে দিলেন।

এর কিছুদিন পর আমিরুল মুমিনিন ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জনসাধারণের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য শামে এলো। হিমসের অধিবাসীরা তাদের গভর্নরদের ব্যাপারে সব সময় বেশি অভিযোগ করত। ওমর রাদিয়াল্লাহু পৌঁছামাত্রই অধিবাসীরা তার সাথে দেখা করতে এলো হযরত ওমর রাঃ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা তোমাদের আমিরকে কেমন পেয়েছ? তখন তারা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট তাদের আমিরের বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ উত্থাপন করলেন। যার প্রত্যেকটি অভিযোগই একটি অপরটির তুলনায় গুরুতর ছিল। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন অতঃপর আমি তাকে ও তাদেরকে একই মজলিসে একত্রিত করলাম। আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করতে থাকলাম আল্লাহ তায়ালা যেন সাঈদ এর ব্যাপারে আমার ধারনাকে ভুল প্রমাণিত না করেন।

সাঈদ ইবনে আমের ও তার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর মজলিসে উপস্থিত হলো। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম তোমাদের আমিরের ব্যাপারে তোমাদের কি কি অভিযোগ আছে। তারা বলল আমাদের প্রথম অভিযোগ হলো অনেক দেরি করে ঘর থেকে বের হন? আমি বললাম হে সাঈদ এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি? সাঈদ ইবনে আমের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তখন কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর বলতে লাগলেন আল্লাহর কসম করে বলছি আমি এই বিষয়টি কারো সামনে বলতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু এখন বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে আসলে আমার ঘরে কোন চাকর চাকরানী নেই এজন্য প্রত্যেক দিন সকালে আমি আঠা গুলাই তারপর খামিরা তৈরি করি। তারপর আমার নিজ হাতে পরিবারের জন্য রুটি বানাই। অতঃপর অজু করে জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য বাহিরে বের হয়ে আসি।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন তারপর আমি অভিযোগকারীদের বললাম তোমাদের আর কোন অভিযোগ আছে কি? দ্বিতীয় অভিযোগ হলো তিনি রাতে আমাদের কারো ডাকে সাড়া দেন না। আমি বললাম হে সাঈদ এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি? আল্লাহর কসম করে বলছি এ বিষয়টিও আমি কারো সামনে

প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু এখন বাধ্য হয়েই প্রকাশ করতে হচ্ছে। আসলে আমি আমার দিনের সময় গুলোকে জনসেবা মূলক কাজের জন্য নির্ধারণ করেছি। আর রাতের সময় গুলোকে আমার রবের ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করেছি।

ওমর (রাঃ) বলেন এরপর আমি অভিযোগকারীদেরকে বললাম তোমাদের আর কোন অভিযোগ আছে কি? তারা বলল হা! আমাদের তৃতীয় অভিযোগ হলো! প্রত্যেক মাসে একদিন তিনি ঘর থেকে বাহিরে বের হন না। আমি বললাম হে সাঈদ এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি? সাঈদ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হে আমীরুল মুমিনীন এই পরিধেয় কাপড় ছাড়া আমার আর কোনো কাপড় নেই। তাই মাসে একবার কাপড় টিকে ধৌত করি এবং শুকানোর অপেক্ষায় ঘরে অবস্থান করি। দিন থেকে কাপড় শুকানো শেষ হলে ঘর থেকে বের হই।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন তারপর আমি তাদেরকে বললাম তোমাদের আর কোন অভিযোগ আছে কি? তারা বলল হা আছে। আমাদের চতুর্থ অভিযোগ হলো। মাঝেমধ্যে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন ফলে তিনি তার মজলিসে উপস্থিত হতে পারেন না। আমি বললাম হে সাঈদ এর কারণ কি? সাঈদ ইবনে আমের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন আমি মুশরিক অবস্থায় খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর মৃত্যু যন্ত্রণা দেখেছি। আমি দেখেছি কিভাবে মুশরিকরা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করছিল। তার শরীর থেকে এক একটি অঙ্গ কেটে ফেলা হচ্ছিল। আর তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল। তুমি কি চাও তোমার স্থানে মোহাম্মদ কে রাখা হবে। আর তুমি নিরাপধে বাড়ি ফিরে যাবে। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছিলেন আল্লাহর কসম করে বলছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হবে আর আমি নিরাপধে পরিবার পরিজন এর নিকট ফিরে যাব এটা কিছুতেই হতে পারে না। আল্লাহর কসম করে বলছি আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ে, যখনই খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হত্যার দৃশ্যটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন আমি আমার নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি না। তখন আমাকে আমার নিজের কাছেই খুব অপরাধী মনে হয়। কেননা আমি তো সেখানে উপস্থিত থেকেও খুবাইবের জন্য কিছুই করতে পারিনি এবং আমার মনে হয় আল্লাহ তাআলা হয়তো আমাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না। এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি। আমি অচেতন হয়ে যায়।

এ কথা শেষ হওয়া মাত্রই ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবেগজনিত কণ্ঠে বলে উঠলেন। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া যিনি সাঈদ এর ব্যাপারে আমার ধারনা কে সত্য প্রমাণিত করেছে। তারপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনায় ফিরে এলেন। সাঈদ ইবনে আমের নিকট ১০০০ দিনার পাঠিয়ে দিলেন। সাঈদ ইবনে আমের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর স্ত্রী দিনার গুলো দেখা মাত্রই। আলহামদুলিল্লাহ বলে উঠলেন এবং বলল হয়তো আমাদের কষ্ট দূর হবে। আপনি এই দিনার গুলো দিয়ে একজন গোলাম ক্রয় করে আনুন। আর কিছু খাবারের ব্যবস্থা করুন। সাঈদ ইবনে আমের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তার স্ত্রীকে বললেন, এই দিনার গুলো দিয়ে এর চেয়ে ভালো কিছু করা যায় না। স্ত্রী বললেন সেটা আবার কি? সাঈদ ইবনে আমের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন এই দিনার গুলোকে আমরা এমন এক মহান সত্তা র নিকট আমানত রাখবো। যিনি আমাদের তীব্র প্রয়োজনের সময় আমাদের কাছে এগুলোকে ফিরিয়ে দিবেন। স্ত্রী বললেন আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে এটা কিভাবে রাখব। সাঈদ ইবনে আমের (রা:) বললেন, আমরা আল্লাহ তায়ালাকে ঋন দিবো। স্ত্রী আনন্দ ভরা কণ্ঠে বললেন আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে তাই করুন।

হযরত সাঈদ ইবনে আমের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু মজলিস থেকে উঠার আগেই দিনার গুলোকে বিভিন্ন থলের মাঝে ভাগ করে রাখলেন এবং পরিচিত একজনকে ডেকে বললেন। যাও এই থলেটি অমুক বিধবা নারীকে দিয়ে আসো। যাও এই থলেটি ঐ এতিমদের দিয়ে এসো। এই থলেটি অমুক মিসকিনদের দিয়ে এসো। এই থলেটি অমুক ব্যক্তি দরিদ্র সন্তানদের দিয়ে এসো। এভাবে বন্টন করতে করতে সব দিনারগুলোকে শেষ করে ফেললেন।

আল্লাহ তাআলা সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর উপর রহম করুন। তিনি নিজের প্রয়োজন থাকা সত্বেও সর্বদা অন্যকে প্রাধান্য দিতেন। হে আল্লাহ আমাদেরকে তার মত জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন। আমিন। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

মুল কণ্ঠকার শায়েখ তামিম আল আদনানী (হাফিঃ)

সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবনী : পর্ব-৩

সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আমরা রাসুল (সাঃ) এর বিশিষ্ট খাদেম হযরত আনাস ইবনে মালিক আল-আনসারী রাঃ এর জীবনী নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করবো ইন শা আল্লাহ্। আনাস ইবনে মালিক ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় নিষ্পাপ এক ছোট বালক তার মা তাকে শিখিয়ে ছিলো কালেমাতু শাহাদাহ। তার কোমল হৃদয় পূর্ণ করে দিয়েছিল মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ (সা) এর ভালোবাসায়। ছোট্ট আনাস রাসুলের গল্প শুনতে শুনতে ভালোবাসায় পাগল পারা হয়ে গিয়েছিলো। সে সব সময় ভাবতো হায় আমি যদি মক্কায় ছুটে যেতে পারতাম প্রিয় রাসুলের চেহারা খানি একবার দেখতে পেতাম অথবা তিনিই যদি ইয়াসরিবে চলে আসতেন আমাকে সাক্ষাতের সুযোগ করে দিতেন তার এই আশা আকাংখার কিছু দিন অতিবাহিত হতে না হতেই মদিনায় সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল প্রিয় রাসূল (সা) তার সাথি আবু বক্কর সিদ্দিক রা. কে নিয়ে মদিনার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। এই সংবাদ শুনা মাত্রই মদিনার প্রতিটি ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে লাগল প্রতিটা হৃদয় আনন্দে মেতে উঠলো সবাই ব্যাকুল হয়ে রাসূল (সাঃ) এর পথ পানে তাকিয়ে রইলো। এরপর প্রতি দিন সকালেই শিশু বালকেরা হই চই করে গুঁজব ছড়াতো যে মোহাম্মদ (সাঃ) এসে পরেছে একথা শুনা মাত্রই ছোট্ট আনাসও শিশু বালকদের সাথে বেরিয়ে যেতো কিন্তু কাওকে না পেয়ে চিন্তিত ও বিষন্ন মনে ঘরে ফিরে আসতো।

কোন এক আলোকিত সকালে মদিনার বড় বড় পুরুষ লোকেরা সুউচ্চ কণ্ঠে ঘোষনা করলো মোহাম্মদ (সাঃ) ও তার সাথি মদিনার কাছাকাছি চলে এসেছে একথা শুনা মাত্রই মদিনার পুরুষেরা দলে দলে বের হয়ে গেলো রাসূল (সাঃ) কে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য ছোট্ট শিশু কিশোরদের অন্তরেও উপচে পরা আনন্দ উল্লাস আর সেই শিশু কিশোরদের অগ্রভাগেই ছিলেন আন্নাস বিন মালেক রা. রাসূল (সাঃ) তার সঙ্গী আবু বক্কর রা. কে নিয়ে মদিনায় আগমন করলেন ছোট্ট শিশু কিশোরেরা বিভিন্ন কবিতা আবৃতি করে রাসূল (সাঃ) কে অভিবাদন জানাতে লাগলো রাসূল (সাঃ) ও আবু বক্কর রা. সারি বদ্ধ মানুষের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন অন্তপুরের মহিলারাও বাড়ির ছাদের উপর বসে বসে রাসূল (সাঃ) এর

এর আগমনের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখছিল আর একে অপরকে জিঙ্গাসা করছিলো যে কোনটি তিনি কোনটি মোহাম্মদ (সাঃ)!

রাসুলের আগমনের সেই দিনটি ছিলো এক অবিস্মরণীয় দিন। আনাস বিন মালেক রা. মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেই দিনটির কথা ভুলতে পারেননি। তার শতাধিক বছরের জীবনে রাসুল সঃ এর আগমনের সেই দিন টি অবিস্বরনীয় হয়ে ছিল। রাসুল সঃ সবেমাত্র মদিনায় এসেছেন এখনও তিনি মদিনায় এসে স্থির হতে পারেন নি এমন সময় আনাস রাদিআল্লাহু আনহুর মা উমাইসা বিনতে মিলহান তার ছোট বালক কে নিয়ে রাসুল সঃ এর কাছে এসে উপস্তিত হলেন, তিনি রাসুল সঃ কে সালাম দিয়ে বললেন ইয়া রাসুলুল্লাহ আনসারদের প্রতিটি নারী পুরুষ কিছু না কিছু হাদিয়া দিয়ে দিয়েছে কিন্তু আমি এমন এক হতভাগা যে আমার কাছে এমন কিছুই নেই যা আপনাকে হাদিয়া দিব। ইয়া রাসুলুল্লাহ আমার ছোট এই বালক টিকে আপনার খেদমতের জন্যে উৎসর্গ করছি। দয়া করে আপনি আমার এই হাদিয়া টুকু গ্রহণ করুন আপনি তাকে আপনার খাদেম হিসেবে নিয়ে নিন। রাসুল সঃ শিশু বালক টিকে পেয়ে খুব খুশি হলেন এবং হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তাকে গ্রহণ করলেন। রাসুল সঃ তার পবিত্র কোমল হাত টি তার মাথায় বুলিয়ে দিলেন এবং তাকে তার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু মাত্র দশ বছর বয়সেই প্রিয় নবীর খেদমতের সৌভাগ্যে অর্জন করেছিলেন এবং রাসুল সঃ এর ইন্তিকালের আগ পর্যন্ত তিনি তার তত্তাবধানে ছিলেন। আনাস বিন মালেক রঃ দীর্ঘ দশ বছর রাসুল সঃ এর খেতমত করেছেন। এই দীর্ঘ দশ বছর বয়েসে তিনি রাসুল সঃ এর কাছ থেকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা পেয়েছিলেন যার মাধ্যমে তিনি তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছিলেন এবং তিনি রাসুল সঃ এর অসংখ্য হাদিস দ্বারা নিজের অন্তর কে পরিপূর্ণ করেছিলেন। তিনি রাসুল সঃ এর জীবনী এবং রাসুল সঃ এর উত্তম আখলাক সম্পর্কে এমন কিছু বিষয় জেনে ছিলেন যা অন্য কেউ জানতো না। আনাস রাদিআল্লাহু আনহু রাসুল সঃ এর কাছ থেকে এত পরিমাণ আদর স্নেহ পেয়েছিলেন যা কোন সন্তান তার পিতা মাতার কাছ থেকেও পাই না। আনাস বিন মালেক রঃ রাসুল সঃ এর উন্নত চরিত্র ও মহৎ স্বভাব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আসুন রাসুল সঃ এর ছোট খাদেম আনাস রাদিআল্লাহু আনহুর মুখ থেকেই শুনি এমন কিছু উত্তম চরিত্র এবং স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে কথা। কেননা তিনিই তো রাসুল সঃ এর আখলাক সম্পর্কে অনেক বেশি অবগত ছিলেন। আনাস বিন মালেক রঃ

বলেন রাসুল সঃ হলেন সর্বত্তোম চরিত্র এবং প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন, তিনি বলেন রাসুল সঃ আমাকে একদিন কোন একটি কাজে পাঠালেন, আমি সেই কাজের উদ্দেশ্যে বের হলাম কিন্তু পথি মধ্যে যেয়ে দেখলাম বাচ্চারা খেলা ধুলা করছে আমিও তাদের সাথে খেলাধুলায় ব্যস্ত হয়ে গেলাম এবং আমাকে যে কাজের জন্যে পাঠানো হয়েছিল সে কাজের কথা ভুলে গেলাম, হঠাৎ করে আমি অনুভব করলাম আমার পেছনে কে যেন দাড়িয়ে আছে এবং হালকা ভবে আমার কাপড় ধরে টানছে আমি পেছনে তাকিয়ে চমকে উঠলাম, দেখলাম রাসুল সঃ দাড়িয়ে আছেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, হে আনাস.! তোমাকে যে কাজের জন্যে পাঠিয়েছিলাম সে খানে কি যাও নি.? আমি হতভম্ব হয়ে বললাম হ্যাঁ এক্ষুণি যাচ্ছি ইয়া রাসুলুল্লাহ।

আল্লাহর কসম করে বলছি আমি দশ বছর ধরে রাসুল সঃ এর খেদমত করেছি আমি যখন ভুল কাজ করেছি তিনি কখনও আমাকে বলেন নি হে আনাস তুমি এইটা কেন করলে, আবার যখন কোন কাজ করিনি কখনও তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বলেননি তুমি এইটা কেন করলে না। রাসুল সঃ যখন আনাস রাদিআল্লাহু আনহু কে ঢাকতেন তখন তিনি তার নাম টিকে ছোট করে অতি আদর মেখে বলতেন হে উনাইস.! আবার কখনও বলতেন হে বুনাইয়া.! হে আদরের পুত্র। তিনি তাকে প্রচুর পরিমাণে উপদেশ দিতেন। রাসুল সঃ এর উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আনাস রাদিআল্লাহু আনহুর অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

রাসুল সঃ এর ইন্তেকালের পর আনাস ইবনে মালেক রাদিআল্লাহু আনহু আশি বছরেরও বেশি জীবিত ছিলেন। তিনি এই দীর্ঘ সময়ে মানুষের অন্তর সমুহকে ইলমে নববী দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। মানুষের মাঝে দ্বীনের জ্ঞান বিতরনে ব্যস্ত ছিলেন। সাহাবী এবং তাবীঈনদের মধ্যে থেকে যখনি কেউ কোন বিষয়ে দ্বিদাধন্দে পরত যখনি ইসলামের কোন বিষয়ে বুঝতে জটিলতা সৃষ্টি হত তখনি তারা সেই বিষয় টি পরিষ্কার ভাবে বুঝতে আনাস বিন মালেকের কাছে দৌড়ে ছুটে আসত আর তিনি ইলমি নববীর মাধ্যামে তাদের সকল অস্পষ্ট তাকে দূর করে দিতেন। আনাস বিন মালেক রঃ জীবনে যত দিন বেচে ছিলেন তিনি সবসময় মানুষের সামনে রাসুল সঃ এর কথা বলতেন। রাসুল সঃ এর সাথে সাক্ষাতের দিনটিতে তিনি অনেক অনিন্দিত হয়েছিলেন আবার রাসুল সঃ এর বিচ্ছেদের দিনটিতেও তিনি অনেক ক্রন্দন করেছিলেন। এই জন্যেই তিনি রাসুল সঃ এর

সাথে প্রথম যেদিন সাক্ষাত হয়েছিল সেই দিনটির কথা যখন আলোচনা করতেন তখন তিনি খুবই আনন্দিত হতেন আবার যখন রাসুল সঃ এর ইন্তেকালের দিনটির কথা আলোচনা করতেন তখন তিনি অঝোর ধারায় কাদতে থাকতেন এবং তার পাশে যারা থাকত তারাও কেদে ফেলত। তিনি বলতেন আমি রাসুল এর মদিনায় আগমনের দিনটি কে দেখেছি আবার রাসুল সঃ এর দুনিয়া থেকে বিদায়ের দিনটিও দেখেছি এই দুটি দিন কখনও এক হতে পারে না এই দুটি দিনের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে তিনি যেদিন মদিনায় এসেছিলেন পুরো মদিনা আলোকিত হয়ে গিয়েছিল আর তিনি যেদিন তার রবের ঢাকে সাড়া দিয়ে মদিনা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন পুরো মদিনা অন্ধাকারাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

রাসুল সঃ আনাস বিন মালেকের জন্যে একাধিক বার দুয়া করেছিলেন, তার মধ্যে থেকে একটি দুয়া হল.(.....) হে আল্লাহ আপনি তাকে সম্পদ ও সন্তান দান করুন এবং তার জীবনে বরকত দান করুন। আল্লাহ তা'আলা রাসুল সঃ এর এই দুয়া কে কবুল করেছিলেন। আনাস বিন মালেক রঃ আনসারদের মধ্যে থেকে সব চেয়ে বেশি সম্পদের মালিক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি তার জীবদ্দশায় এক শতাধিক সন্তান ও নাতির চেহারা দেখে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার জীবনেও বরকত দিয়েছিলেন তিনি দীর্ঘ এক শতাব্দী এর সাথে আরও তিন বছর জীবিত ছিলেন।

আনাস বিন মালেক রঃ কিয়ামতের মাঠে রাসুল সঃ এর শাফায়াতের ব্যাপারে তীব্র আশাবাদী ছিলেন তিনি প্রায়ই বলতেন আমি কিয়ামতের মাঠে রাসুল সঃ এর সামনে হাজির হয়ে বলব ইয়া রাসুলুল্লাহ আমার দিকে একটু লক্ষ্য করুন আমি হচ্ছি আপনার ছোট খাদেম উনাইস। আনাস বিন মালেক রঃ যখন মৃত্যু মুখে উপনিত হলেন তখন তিনি তার পরিবার কে বললেন তোমরা আমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ এই কালিমার তালকীন কর অতপর তিনি এই কালিমা পাঠ করতে করতে মৃত্যু বরন করলেন এবং তিনি অসিয়ত করেছিলেন রাসুল সঃ এর ছোট লাঠিটি যেন তার সংগে কবরে দাফন করে দেয়া হয়, তার কথা মতই লাঠিটি তার কাফনের সাথে জড়িয়ে কবরে দাফন করে দেয়া হল।

অভিনন্দন আনাস বিন মালেক রঃ এর জন্যে আল্লাহ তা'আলা তার উপর পরিপূর্ণ অনুগ্রহ করেছিলেন। তিনি রাসুল সঃ এর সহচার্যে কাটিয়েছিলেন দীর্ঘ দশটি বছর

হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তৃতীয় ব্যক্তি অন্য দু'জন হলেন আবু হুরাইরাহ রাদিআল্লাহু আনহু এবং আব্দুল্লাহ এবনে উমর। আল্লাহ তা'আলা তাকে ও তার মমতাময়ী মা গুমাইসা বিনতে মিলহান কে মুসলিম জাতির পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করন, আমিন।

ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২০৩০

তিন কথার দাওয়াত ও তিন দিনের আমানঃ প্রকৃত নবীওয়ালা ও সাহাবীওয়ালা কাজ/তাবলীগ

Abu Zor Gifari

Senior Member

০৪-০২-২০১৯

রুস্তমের সাথে সাক্ষাতের কাহিনী

মুহাম্মাদ রহ., তালহা রহ., আমর রহ. ও যিয়াদ রহ. আপন আপন সনদে বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ (রা.) লোক পাঠিয়ে মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) সহ অন্যান্য সাহাবাদের (রা.) একটা জামাতকে ডাকলেন এবং বললেন,

-'আমি তোমাদেরকে রুস্তম ও তার লোকদের নিকট পাঠাতে চাই। এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি?'

-তারা সকলে বললেন, 'আপনি যে কোন হুকুম করবেন আমরা তার অনুসরণ করব এবং তা পূর্ণ করব। আর সেখানে যাওয়ার পর যদি এমন কোন বিষয়ের সম্মুখীন হই যার ব্যাপারে আপনার পক্ষ থেকে কোন ফয়সালা না হয়ে থাকে তবে সে বিষয়ে চিন্তা-ফিকির করে যা অধিক উত্তম হবে এবং লোকদের জন্য অধিক উপকারী হবে আমরা তাই তাদেরকে বলব।'

-সা'দ (রা.) বললেন, 'বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ লোকেরা এরূপই করে থাকে। তোমরা যাও এবং সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।'

-রিবঈ ইবনে আমের (রা.) বললেন, 'অনারব লোকদের নিজস্ব নিয়ম-পদ্ধতি ও আদব-কায়দা রয়েছে। আমরা এত লোক একসাথে যখন তাদের নিকট যাব তখন তারা মনে করবে আমরা তাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছি। অতএব আপনি তাদের নিকট একজনের অধিক পাঠাবেন না।' সকলেই রিবঈ ইবনে আমের (রা.) এর রায়কে সমর্থন করল। তারপর রিবঈ (রা.) বললেন, 'আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে আমাকে পাঠিয়ে দিন।' সুতরাং সা'দ (রা.) তাকে পাঠানোর ফয়সালা করে দিলেন।

রিবঈ ইবনে আমের (রা.) রুস্তমের সেনা ছাউনীতে তার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পুলের উপর মোতায়েন সিপাহী রিবঈ ইবনে আমের (রা.) কে থামাল এবং তার আগমনের সংবাদ দিয়ে রুস্তমের নিকট লোক পাঠাল।

-রুস্তম পারস্যের বড় বড় সর্দারদের সাথে পরামর্শ করল এবং বলল, 'তোমাদের কি রায়? আমরা কি শুধু আমাদের সংখ্যাধিক্যের উপর গর্ব করব, না আমাদের জাঁকজমক, শান শওকত দেখিয়ে আরবদেরকে প্রভাবিত করব এবং তাদের তুচ্ছতা প্রকাশ করব?'

-তারা সকলে একমত হল যে, শাহী জাঁকজমকের প্রদর্শনী দ্বারা তাদের তুচ্ছতা প্রকাশ করা হোক। অতএব শাহী কোষাগার থেকে সাজসজ্জার জিনিসপত্র বের করে সাজিয়ে ফেলল। চারদিকে মূল্যবান গদি, বিছানা ও গালিচা বিছাল। কোষাগারের কিছুই অবশিষ্ট রাখল না। রুস্তমের জন্য সোনার সিংহাসন রাখা হল এবং তাকে মূল্যবান কাপড় দ্বারা সাজানো হল, দামী দামী গালিচা বিছানো হল, সোনার তার দ্বারা বুনানো বালিশ রাখা হল।

-রিবঈ ইবনে আমের (রা.) কে পুলের উপর মোতায়েন সিপাহী সামনে যাওয়ার অনুমতি দিলে তিনি নিজ ঘোড়ার পিঠে চড়ে রওয়ানা হলেন। তার ঘোড়া অধিক চুলওয়ালা ও খাট ছিল। আর তার নিকট কাপড় দ্বারা পেঁচানো একটি অত্যন্ত চকচকে তরবারি ছিল এবং তার বর্শার সাথে চামড়ার ফিতা লাগানো ছিল। তার নিকট গরুর চামড়া নির্মিত একটি ঢাল ছিল, তার উপর রুটির ন্যায় গোল লাল রঙের চামড়া লাগানো ছিল। আর তার সাথে নিজের তীর-ধনুকও ছিল। তিনি যখন সে শাহী দরবারের নিকটবর্তী হলেন তখন প্রথম গালিচার নিকট পৌঁছুতেই সেখানকার লোকেরা বলল, ঘোড়া থেকে নীচে নামুন। কিন্তু তিনি ঘোড়াকে গালিচার উপর উঠিয়ে দিলেন। ঘোড়া সম্পূর্ণরূপে গালিচার উপর উঠার পর তিনি ঘোড়া থেকে নামলেন। অতঃপর দুটি বালিশ ছিঁড়ে তার ভিতর ঘোড়ার লাগাম প্রবেশ করিয়ে তার সাথে বাঁধলেন। তার এ কাজে তাকে কেউ কোনরূপ বাঁধা দিতে সাহস পেল না।

রিবঈ ইবনে আমের (রা.) দেখতেই তাদের উদ্দেশ্য বুঝে গিয়েছিলেন যে, তারা শাহী জাঁকজমক দেখিয়ে আমাদেরকে প্রভাবিত করতে চাচ্ছে। এ কারণে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এ কাজ করলেন যাতে তারা বুঝতে পারে যে, এ সমস্ত

জাঁকজমকের দ্বারা তিনি কোনরূপ প্রভাবিত হন নি। তিনি একটি বর্ম পরিধান করেছিলেন যা দেখতে একটি হাউজের ন্যায় লম্বা চওড়া ছিল। তিনি উটের পিঠে হাওদার নীচে যে ছালার চট বিছানো হয় তাকে মাঝখান দিয়ে ছিড়ে আলখেল্লা স্বরূপ পরিধান করেছিলেন এবং ছালের রশি দ্বারা মাঝখানে কোমরবন্ধ হিসেবে বেঁধে নিয়েছিলেন। মাথায় পাগড়ি বেঁধে রেখেছিলেন। আর তার পাগড়ী ছিল উটের চামড়ার লাগাম! তিনি আরবের মধ্যে সর্বাধিক চুলওয়ালা ছিলেন এবং মাথায় চারটি চুলের ঝুটি ছিল, যা পাহাড়ি বকরির শিংয়ের ন্যায় খাড়া হয়ে ছিল। দরবারের লোকেরা বলল, আপনি এখানে আপনার অস্ত্র-শস্ত্র খুলে রাখুন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের নিকট নিজ প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় আসি নি যে, তোমাদের কথায় অস্ত্র নামিয়ে রাখব। তোমরাই আমাকে ডেকেছ। আমি যেমনভাবে চাইব তেমনভাবে যদি আসতে দাও তবে ঠিক আছে, নতুবা আমি ফিরে যাচ্ছি! লোকেরা রুস্তমকে এ সংবাদ দিলে রুস্তম বলল, তাকে এভাবেই আসতে দাও। সে তো একজনই মাত্র।

রিবঈ ইবনে আমেরের (রাঃ) বর্শার মাথায় ধারালো ফাল লাগানো ছিল। তিনি ছোট কদমে বর্শার উপর ভর দিয়ে চলতে লাগলেন। এভাবে তিনি সমস্ত গালিচা ও বিছানাকে ছিঁড়ে নষ্ট করে দিলেন। তিনি যখন রুস্তমের নিকট পৌঁছলেন তখন প্রহরীগণ তাকে ঘিরে নিল। আর তিনি বিছানার উপর বর্শা গেড়ে স্বয়ং মাটির উপর বসে পড়লেন। তারা জিজ্ঞেস করল, আপনি এরূপ কেন করলেন? তিনি উত্তর দিলেন, তোমাদের সাজসজ্জার এ সমস্ত জিনিসের উপর আমরা বসতে চাই না। অতঃপর রুস্তম কথা বলতে আরম্ভ করল এবং বলল, আপনারা আরব দেশ থেকে কেন এখানে এসেছেন? রিবঈ (রাঃ) বললেন,

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে এখানে এজন্য নিয়ে এসেছেন যেন তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে বান্দাগণের বন্দেগী থেকে বের করে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে তার প্রশস্ততার দিকে ও সমস্ত ধর্মের জুলুম অত্যাচার থেকে বের করে দ্বীনে ইসলামের ইনসাফের দিকে নিয়ে আসি।... রুস্তম তার কাওমের সর্দারদেরকে বলল, 'তোমাদের নাশ হোক! তোমরা তার কাপড় দেখিও না, বরং তার বুদ্ধিমত্তা ও কথা এবং তার আচার-আচরণ ও জীবন পদ্ধতিকে দেখ! আরবের লোকেরা (মুসলিমরা) কাপড় চোপড় ও খাওয়া দাওয়াকে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু বংশগত গুনাবলীকে অতি যত্নসহকারে সংরক্ষণ করে। তারা লেবাস পোশাকে তোমাদের

মত নয়, তোমরা যেরূপ গুরুত্ব দাও তারা সেরূপ গুরুত্বই দেয় না।' অতঃপর তারা রিবঈ ইবনে আমের রাঃ এর অস্ত্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে লাগল এবং তাকে মামুলী ও অতি নিকৃষ্ট বলতে লাগল। রিবঈ ইবনে আমের (রাঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের যুদ্ধ পারদর্শিতা আমাকে দেখাও, আর আমিও তোমাদের দেখাই। এ বলে তিনি নেকড়ার ভিতর থেকে নিজের তরবারি বের করলেন যেন একটি অগ্নিশিখা। তারা বলল, তরবারি আবৃত করে রাখ। তিনি তা নেকড়া দ্বারা আবৃত করে ফেললেন। তারপর রিবঈ ইবনে আমের (রাঃ) তাদের ঢালের উপর তীর নিক্ষেপ করলে তা ফেটে গেল। আর তারা রিবঈ (রাঃ) এর ঢালের উপর তীর নিক্ষেপ করল, কিন্তু তা ফাটল না। বরং যেমন ছিল তেমনি রইল। অতঃপর রিবঈ (রাঃ) বললেন, হে পারস্যবাসী, তোমরা খাওয়া, পান করা ও লেবাস পোশাককে বড় জিনিস মনে কর, আর আমরা তাকে নগণ্য জিনিস মনে করি। তারপর রিবঈ ইবনে আমের (রাঃ) তাকে চিন্তা করার জন্য তিন দিন সময় দিয়ে ফিরে আসলেন।

-পরদিন রুস্তম পয়গাম পাঠাল যে, পূর্ব ব্যাক্তিকে পুণরায় পাঠাও। সা'দ (রাঃ) হুযাইফা ইবনে মেহসানকে (রাঃ) পাঠালেন। তিনিও রিবঈ (রাঃ) এর ন্যায় সাধারণ পোশাকে এবং সাদাসিধে অবস্থায় রওয়ানা হলেন। যখন প্রথম গালিচার নিকট পৌঁছলেন তখন সেখানকার লোকেরা বলল, আপনি সওয়ারী থেকে নীচে নামুন। তিনি বললেন, আমি যদি নিজ প্রয়োজনে আসতাম তবে নামতাম। তোমরা তোমাদের বাদশাহকে জিজ্ঞেস কর, আমি কি তার প্রয়োজনে এসেছি, না আমার নিজের প্রয়োজনে এসেছি? যদি বলে, আমার প্রয়োজনে এসেছি তবে সে ভুল বলেছে। আমি তোমাদের ছেড়ে ফিরে চলে যাব। আর যদি বলে, তার প্রয়োজনে এসেছি তবে আমি যেভাবে চাইব সেভাবে তোমাদের নিকট আসব। রুস্তম শুনে বলল, তাকে ছেড়ে দাও, যেভাবে আসতে চায় আসতে দাও। হুযাইফা ইবনে মেহসান (রাঃ) সামনে অগ্রসর হলেন এবং রুস্তমের নিকট গিয়ে দাড়িয়ে গেলেন। রুস্তম তার সিংহাসনে বসে ছিল। সে বলল, সওয়ারী থেকে নীচে নামুন। হুযাইফা ইবনে মেহসান (রাঃ) বললেন, আমি নীচে নামব না। তিনি যখন নামতে অস্বীকার করলেন তখন রুস্তম জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, আজ আপনি আসলেন, গতকাল যিনি আমাদের নিকট এসেছিলেন, তিনি আসলেন না কেন? হুযাইফা ইবনে মেহসান (রাঃ) বললেন, আমাদের আমীর (সা'দ রাঃ) কঠিন ও নরম সর্বাবস্থায় আমাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা পছন্দ করেন। এজন্য গতকাল

তার পালা ছিল আর আজ আমার পালা। রুস্তম বলল, আপনারা কেন এসেছেন? হুযাইফা ইবনে মেহসান (রাঃ) বললেন,

আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে আপন দ্বীন দান করে আমাদের উপর দয়া করেছেন, আমাদেরকে আপন কুদরতের নিদর্শনসমূহ এমনভাবে দেখিয়েছেন যে, আমরা তা বুঝতে পেরেছি, অথচ ইতিপূর্বে আমরা এ বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে আদেশ করেছেন যেন আমরা সমস্ত মানুষকে তিন বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার আহ্বান জানাই। তারা যে কোনটি গ্রহণ করবে আমরা তাকে মেনে নেব। প্রথম হলঃ ইসলাম গ্রহণ কর। যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে আমরা তোমাদেরকে ছেড়ে চলে যাব। দ্বিতীয় বিষয় হলঃ যদি ইসলাম গ্রহণ না কর তবে জিজিয়া প্রদান কর। যদি জিজিয়া প্রদান কর তবে তোমাদের প্রয়োজন হলে আমরা তোমাদেরকে দুশমনের হাত থেকে হেফাজত করব। তৃতীয় বিষয় হলঃ যদি এ দুটির একটিও গ্রহণ না কর তবে যুদ্ধ ও মোকাবিলা হবে। রুস্তম বলল, কিছু দিনের জন্য কি সন্ধি হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিন দিনের জন্য হতে পারে। তবে গতকাল থেকে সেই তিন দিন গণ্য হবে।

রুস্তম যখন হুযাইফা ইবনে মেহসান (রাঃ) থেকে সে একই উত্তর পেল যা সে রিবঈ ইবনে আমের (রাঃ) থেকে পেয়েছিল তখন হুযাইফা ইবনে মেহসানকে (রাঃ) ফেরত পাঠিয়ে দিল এবং নিজ সাথীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলল, 'তোমাদের নাশ হোক! তোমরা আমার মতামতকে কেন বুঝতে পারছ না? গতকাল এক ব্যাক্তি আমাদের নিকট আসল এবং আমাদের জমিনে আমাদের উপর জয়ী হয়ে গেল, আমাদের মূল্যবান জিনিসপত্রকে তুচ্ছ গণ্য করে দেখাল। মূল্যবান জিনিসের উপর সে তার ঘোড়া উঠিয়ে খাড়া করল, আর আমাদের মূল্যবান বালিশের সাথে ঘোড়া বাঁধল। সে এটা দ্বারা পূর্বাভাস গ্রহণ করে আমাদের জমিন ও তাতে যা কিছু আছে সমস্তই তার সাথীদের নিকট নিয়ে চলে গেল। উপরন্তু সে অত্যন্ত বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যাক্তি ছিল। আজ এ দ্বিতীয় ব্যাক্তি আমাদের নিকট আসল এবং আমাদের মাথার উপর এসে দাঁড়াল। সেও পূর্বাভাস নিয়ে গেল। সে তো আমাদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের জমিন দখল করে নিবে।' রুস্তমের সাথীগণও তাকে কঠোর ভাষায় উত্তর দিল এবং এভাবে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে একপর্যায়ে রুস্তম রাগান্বিত হয়ে গেল এবং তার সাথীগনও রাগান্বিত হয়ে গেল।

-পরের দিন রুস্তম পয়গাম পাঠাল যে, আমাদের নিকট একজন লোক পাঠাও। সুতরাং মুসলমানগন মুগীরা ইবনে শো'বাকে (রাঃ) পাঠাল। আবু উসমান নাহদী রহ. বলেন, মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) পুলের উপর পৌঁছলেন এবং পুল পার হয়ে পারস্যবাসীদের নিকট যেতে চাইলে পাহারাদারগণ তাকে আটকাল এবং রুস্তমের নিকট তার ব্যাপারে অনুমতি চাইল। তারা সাহাবাদের (রাঃ) প্রভাবিত করার জন্য যে সকল শাহী ব্যাবস্থা গ্রহণ করেছিল সমস্ত কিছুই বহাল ছিল, কোন পরিবর্তন করে নি। তারা মাথার মুকুট ও সোনার তার দ্বারা বুনানো কাপড় পরিধান করেছিল। তীর নিক্ষেপ করলে যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত গালিচা বিছিয়ে রেখেছিল। বাদশাহ পর্যন্ত পৌঁছুতে তার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না।

রুস্তম অনুমতি দিলে মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রাঃ) সেখান থেকে অগ্রসর হলেন। তার চুলে চারটি বেণি ছিল। তিনি চলতে চলতে রুস্তমের সিংহাসন ও গদীর উপর গিয়ে বসে গেলেন। এতে তারা সকলে মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রাঃ) এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে ধরে ঝাঁকাতে লাগল। অবশেষে তাকে সিংহাসন থেকে নীচে নামিয়ে দিল। মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রাঃ) বললেন, 'আমাদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছিল যে, তোমরা নাকি অনেক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোক, কিন্তু আমি তো তোমাদের ন্যায় বোকা ও মূর্খ লোক আর দেখিনি! আমরা আরবের লোকেরা(মুসলিমরা) সকলেই সমান। আমাদের মধ্য থেকে কেউ কাউকে গোলাম বানায় না, হ্যাঁ, যদি কারো সাথে যুদ্ধ হয় তবে ভিন্ন কথা। আমার ধারণা ছিল, তোমরাও বোধ হয় আমাদের মতই পরস্পর সমতা বজায় রেখে চল। তোমরা যা করেছ তা অপেক্ষা উত্তম এটা ছিল যে, আমাকে পূর্বেই জানিয়ে দিতে যে, তোমরা পরস্পর সমান নও, বরং একে অপরের রব। রুস্তমের সাথে এক আসনে বসা যদি তোমাদের মতে ঠিক না হয়ে থাকে তবে আগামীতে আমরা এরূপ করব না। তোমাদের নিকট আমি নিজ প্রয়োজনে আসি নি। তোমরা ডেকেছ বলে এসেছি। আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমাদের শাসনক্ষমতা দূর্বল হয়ে গেছে এবং তোমরা পরাজিত হবে। এ ধরনের নীতি ও জ্ঞানবুদ্ধির উপর কোন রাজত্ব টিকে থাকতে পারে না।'

সাধারণ লোকেরা মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রাঃ) এর কথা শুনে বলল, খোদার কসম, এ আরবী সঠিক ও সত্য কথা বলেছে। আর তার মাতব্বরগণ বলল,

খোদার কসম, এ ব্যক্তি তো এমন এক কথার তীর নিক্ষেপ করেছে যদ্দরুণ আমাদের গোলামরা সর্বদা আমাদেরকে তাদের দিকে টানতে থাকবে। আমাদের খোদা আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে নিপাত করুন! তারা কেমন আহম্মক ছিল যে, এ সমস্ত আরবদের বিষয়কে মামুলী ও সাধারণ জ্ঞান করেছে! আর আজ তারা কি পরিমাণ শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। শুরুতেই তাদের মূল উৎপাটন করে দেয়া উচিত ছিল। বর্ণনাকারী অতঃপর হাদীসের বাকী অংশ উল্লেখ করেছেন, যাতে রুস্তমের বিভিন্ন প্রশ্ন ও মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রাঃ) এর উত্তর উল্লিখিত হয়েছে।

Note:

Ibn Jareer, volume ৩, page: ৩৩,৩৬

হায়াতুস সাহাবাহ (রা)- হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী রহ.

আল্লাহ আমাকে মাফ করুন ও ক্ষমা করে দিন। হয়তো শরীয়াহ নয়ত শাহাদাহ।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৮৮৪

শিক্ষা ব্যবস্থায় এক নজর

আবু বাসীর

Junior Member

০৮-৩১-২০১৯

"শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড"। দেশে বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য। বোদ্ধা মহলের অনেকে শিক্ষার শুরুতে 'সু' সংযোজন করেন। ভিন্নতার মূল কারণ চিন্তাশীলদের বিভিন্নতা। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। বিপত্তি অন্য জায়গায়। মূলত শিখা শিখানো থেকেই শিক্ষার উৎপত্তি। স্রষ্টার সৃষ্টি অস্তিত্বে আসার পর থেকেই শুরু হয় শিক্ষার যাত্রা। তাই শিক্ষার ইতিহাস অনেক পুরোনো। এভাবে যুগের পর যুগ অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে শিক্ষা আজকের সভ্যতায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত আমরা তিন ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা দেখতে পাই। এটিই আজকের আলোচ্য বিষয়।

প্রথম শিক্ষা ব্যবস্থা রাসূল(স.)র নবুওয়ত প্রাপ্তির সময় থেকে নিয়ে ১৭'শ শতাব্দী পর্যন্ত। দ্বিতীয় প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থার যাত্রা ১৭'শ শতাব্দী থেকে। আরেকটি শিক্ষা ব্যবস্থার উদয় হয় ১৮'শ শতাব্দী থেকে। প্রথম প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থার অবকাঠামো তৈরি হয় ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষা পাঠদানের মাধ্যমে। ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হতো একজন মানুষের মূল জরুরি বিষয় ধর্ম হওয়ার কারণে। জাগতিক শিক্ষা দেওয়া হতো এ ধর্ম পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে ও সে অনুযায়ী পৃথিবী শাসন করতে। আদতে এটিই হলো সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রকৃত অর্থে এ জ্ঞান অর্জনই মহান রবের নির্দেশ। এ শিক্ষার একদিকে রয়েছে ঈমান ও তাকওয়ার নূর। অপর দিকে আছে সম্মান, গৌরব ও মর্যাদা। এ শিক্ষা অর্জন করেই একদিকে যেমন আবু বকর, উমর, উসমান ও আলীরা ইলমের সর্বোচ্ছ আসন অলংকৃত করেছেন, অন্যদিকে ঠিক সেভাবেই পুরো অর্ধ দুনিয়ায় প্রতাপ ও দাপটের সাথে রাজত্ব কায়েম করেছেন। দাপিয়ে বেড়িয়েছেন এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। যাদের সম্মুখে মাথা নোয়াতে হয়েছে সুপার পাওয়ার নামধারী কায়সার ও কিসরার হর্তাকর্তাদের। যাদের হুংকারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ত্বাগুতের সেই

সাজানো মসনদ। ইতিহাসের পাতায় আজো যারা অমর হয়ে আছেন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে। রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

এ শিক্ষা অর্জন করেই একদিকে যেমন ইবনে কাসীর ইবনে কাসীর হয়েছেন, একই বিদ্যালয়ের একই শিক্ষা অর্জন করেই সুলতান সালাহুদ্দীন সালাহুদ্দীন হয়েছেন। এ শিক্ষা একজনকে যেভাবে শায়খুল ইসলাম বানিয়েছে, ঠিক সেভাবেই সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহকে পরিণত করেছে বীর সেনানয়কে। যে শিক্ষা সায়্যিদ আহমদকে হাজার বছরের মুজাদ্দিদ বানিয়েছে, সেভাবেই আওরঙ্গজেবকে বানিয়েছে ইসলামের এক অতন্দ্র প্রহরী। বারশত বছর পর্যন্ত যার অবদানে মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় নিজেদের পান্ডিত্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আজকের ইউরোপ-আমেরিকার মতো সেদিন কর্ডোবা-আল হামরার প্রাসাদ ছিল ইউরোপসহ সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান তালাশের একমাত্র স্থান। ষোড়শ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত এরা তো অন্ধকারেই ছিল।

সন্দেহ নেই এমন শিক্ষাই এনে দিতে পারে মুসলিমদের হারানো গৌরব। এমন শিক্ষায় হোয়াইট হাউসে, লালবাগে ও সংসদ ভবনে কালেমা খচিত পতাকা উড়াতে পারে। বিগত সময়ে এ শিক্ষা ব্যবস্থা বিলুপ্ত হলেও সম্প্রতি এর নবজাগরণ শুরু হয়েছে। আশা করি তৃতীয় বিশ্বের সতর্ক প্রহরিরা শিক্ষা ব্যবস্থায় এ থিউরিই ফলো করবে। যা কুফফারদের ঘুম হারাম করে দিতে বাধ্য। দ্বিতীয় প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা হলো যা বৃটিশ প্রনোদিত। এ শিক্ষায় ধর্মীয় জ্ঞান উপেক্ষিত। জাগতিক শিক্ষাই এর মূল অবকাঠামো। ইতিহাসের নামে বিকৃত ইতিহাস উপস্থাপন, সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির প্রচার-প্রসার, অসাম্প্রদায়িক চেতনার নামে ইসলাম ধর্মকে

হেয় প্রতিপন্ন করণ, সহ শিক্ষার নামে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, নারী-পুরুষ তত্ত্বের আড়ালে কোমলমতি শিশুদের মনে যৌনতার বিষবৃক্ষ রুপণ, নারীদের শিক্ষিতকরণ ও নারী-পুরুষ সমান অধিকারের নামে মা জাতিকে রাস্তায় নামিয়ে পণ্য সামগ্রীর ন্যায় প্রদর্শন, আধুনিক শিক্ষার আড়ালে মুসলিম শিক্ষার্থীদের হিন্দুত্ববাদ ও নাস্তিকতার পাঠ শিক্ষাদান, ডিজিটাল ও আধুনিক শিক্ষার নামে সভ্যতার

নামে বিলেতী ও পশ্চিমা সভ্যতার বিস্তার, সর্বোপরি আধুনিকায়নের নামে ইসলামকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে ইসলামের প্রতি জাতির

বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করণ ও পশ্চিমা সভ্যতার আদলে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন এ শিক্ষাব্যবস্তার মূল উদ্দেশ্য।

এ শিক্ষা মানবজাতিকে উন্নতি ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌছে দিলেও তাদের চারিত্রিক অবনতিও ঠিক ততটা নিচে নেমে গেছে। অপরাধ দমনের পরিবর্তে আরো নতুন ও কার্যকর পন্থাসমূহ আবিষ্কার করেছে। পূর্বে চোর-ডাকাতরা সমাজের নিকৃষ্টতম শ্রেণী পরিগণিত হলেও এখন এরাই সমাজের নেতৃত্ব দিচ্ছে। পূর্বে সমাজের উৎকৃষ্ট শ্রেণী সমাজের প্রতিনিধি হলেও এখন সমাজের প্রতিনিধি হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে বড় ডাকাতরা। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এম পি ও মন্ত্রিত্বের পদে উপবেশনকারী আজকের সাংসদ ও মন্ত্রীরাই হলো আজকের সমাজের সবচেয়ে বড় ডাকাত।

চুরি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ধর্ষন, মিথ্যা, প্রতারণা, গুম, খুন, সম্পদ লুটপাট ও আত্মসাৎ, সার্চ, জুলুম, নির্যাতন, আত্মহত্যা, অবৈধ গ্রেফতার, পরকিয়া, চোরা কারবারি, সীমান্তে সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনীর ছত্রছায়ায় অবৈধ চালান ও পাচার, মদ, গাঁজা, ইয়াবা ও মাদকের রমরমা বানিজ্য, নিজ হাতে মা বাবাকে হত্যা, মোটর সাইকেলের জন্য মা বাবার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, বৃদ্ধ মা বাবার সাথে বৃদ্ধাশ্রমের নামে অমানবিক আচরণ , মিথ্যা ও প্রতারণাপূর্ণ নিউজ সরবরাহ, বিনোদনের নামে পত্রিকায় অবৈধ ও কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন, বিনোদনের নামে অশ্লীল মুভি, নাটক ও সিনেমা তৈরি, প্রকাশ্যে বাদ্য-বাজনার মতো অনৈতিক কার্যকলাপের আয়োজন, পর্নোগ্রাফির মতো নিকৃষ্ট শিল্পের মহড়া, ব্যাক্তি স্বাধীনতার নামে ধর্ম নিষিদ্ধকরণ, ধর্মীয় স্বাধীনতার আড়ালে মসজিদে-মন্দিরে সরব উপস্থিতি, বাক স্বাধীনতার আড়ালে রাসূল(স.)র কুৎসা রটনা, মত প্রকাশের স্বাধীনতার আড়ালে ইসলাম ধর্মের বিষোধগার, অবাধ ব্যক্তি মালিকানার নামে অবৈধ সম্পদ কুক্ষিগত করণ, সমাজের রন্ধেরন্ধে নাস্তিকতার অনুপ্রবেশ, অবৈধ বিচার-আদালত, আন্তর্জাতিক অপরাধ, অস্ত্র পরিক্ষার নামে নিহীহ নাগরিক হত্যা, সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার নামে মা-বোনদের রক্ত ঝরানো, জঙ্গিবাদ দমনের নামে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দাদের অকথ্য নির্যাতন, রিমান্ড, ক্রসফায়ার ও ফাঁসী, আল্লাহর পরিবর্তে সুপার পাওয়ারদের রব মানা, কাফিরদের বন্ধু ও অভিভাবকরূপে গ্রহন করা, এ ছাড়া আরো হাজারো রকমের অপরাধ এ শিক্ষা ব্যবস্থারই ফসল। ঈমান ও তাকওয়ার ছোঁয়া না থাকলে এ শিক্ষা মুসলিমদের জন্য

কাল হয়ে দাঁড়াবে। তাই এ শিক্ষায় বাধ্যতামূলক ধর্মীয় শিক্ষা ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তন সময়ের দাবী। তার জন্য এর মাথায় বসে থাকা থাবা বাবাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তদস্থলে বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, ইসলামপ্রিয়, চিন্তাশীল গবেষকদের বসানো প্রয়োজন।

আরেকটি শিক্ষা ব্যবস্থার উদয় হয় ১৮৬৬ সালে। এ শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ আমার সামনে উন্মোচিত থাকলেও অনেকের কাছে তা স্পষ্ট নয়। তাই এর ব্যাপারে কোনো বিরূপ মন্তব্য করতে গেলে আমাকে প্রশ্নের সম্মোখীন হতে হবে। তবুও দু'টি কথা বলে যাই। আমি শিক্ষা ব্যবস্তার একজন নগন্য ছাত্র। তাই আশা করি আত্মসংশোধন দোষের হবে না। এ শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মীয় শিক্ষাকে যতটা না গুরুত্ব দিয়েছে, জাগতিক শিক্ষাকে তারচেয়েও বেশি অবহেলা করেছে। এটি মানুষের মাঝে ছড়িয়েছে ঈমান ও তাকওয়ার নূর, জাতিকে উপহার দিয়েছে একদল সৎ ও চরিত্রবান লোক, কিন্তু জাতির সেই হারানো সম্মান ফিরিয়ে দিতে পারে নি। পারে নি জাতিকে মর্যাদার উচ্ছ আসনে পৌছে দিতে, যেখানে বসে আমাদের পূর্বসূরিরা একদিন পৃথিবী শাসন করেছিলেন।

এ শিক্ষা ব্যবস্থা আলেমের ইলমকে পঙ্গু বানিয়েছে। তাই আজ ইলমগুলো কিতাবের মলাটেই আবদ্ধ। বাস্তব অনুশীলন অস্তিত্বে আসেনি। এ কারণেই ১৯৪৭ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠন হলেও মুসলিমদের আবাসভূমি এ দেশ দারুল ইসলামের গৌরব অর্জন করতে পারে নি। পারবে কিভাবে, আলেমরা দুনিয়া বলে সে স্থান বর্জন করে তুলে দিয়েছিলেন সেক্যুলারদের হাতে। দেশ চালানোর সে হিম্মতটা করতে পারেন নি। একি অবস্থা ১৯৭১ সালে জন্ম নেওয়া লাল-সবুজের এ দেশের। মুক্তিযুদ্ধের শেখদেরকে মুরীদ বানলেও পারেন নি দেশকে ইসলামের আদলে সাজাতে। পারেন নি দেশকে সোনালী অতীতে ফিরিয়ে নিতে, মানবতার পরতে পরতে এ বিস্ময়কর সভ্যতা ছড়িয়ে দিতে। তাই হাজারো-কোটি মুসলিম ও আলেম-ওলামা এ ভূমিতে অবস্থান করলেও দেশের মালিক পক্ষ ঠিকই মুরতাদ সেক্যুলার। কারণ দু'টি:

১. এটি তাঁদের দৃষ্টিতে দুনিয়াদারী। দুনিয়ার পেছনে ছোটা। ২. আলেমরা চাইলেও পারবেন না, কারণ বিশ্বায়নের এ পৃথিবীতে সুপার পাওয়ারদের সাথে টেক্কা দিয়ে রাষ্ট্র চালানোর নূন্যতম বা বাল্যশিক্ষাও তাঁদের কাছে নেই। এ সবের জন্য জাগতিক

শিক্ষায় পূর্ণ দক্ষতা প্রয়োজন যাকে আলেম সমাজ যুগ যুগ ধরে হেয় ও অবহেলা করে আসছেন। ফলাফলে আজ আলেম সমাজের কর্মের ক্ষেত্র মসজিদ-মাদরাসাতেই সীমাবদ্ধ। বিশ্বাস না হলে আপনি ৮০% মাদরাসা ছাত্রকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

তাই এ মহান সমাজের প্রতি আমার জানার বিষয় হলো, রাসূল(স.)র ২৭ টি গযওয়া ও ৪৭ টি সারিয়্যার হাই কমান্ডিং কি ওহীর ইলম ছিল না কি জাগতিক দক্ষতা? যুদ্ব প্রশিক্ষণ, তীর-তলোয়ার, বর্শা-নেযা, মিনজানিক, ঘোড়দৌড়, অবরোধ, পশ্চাৎদাবন, পরিখা খনন, ইয়াহুদ, নাসারা ও মুশরিকদের সাথে লেনদেন ও বোঝাপড়া— এ গুলো কি ওহী ছিল না জাগতিক লাইনে অভিজ্ঞ একজন মহামানবের অনন্য বৈশিষ্ট্য? ছাত্রদের আধুনিক অস্ত্র প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধ প্রশিক্ষণ প্রদান যদি সমস্যা সৃষ্টিকারি ও জঙ্গিবাদ হয়, কেন হাদিসে নিক্ষেপ ও প্রশিক্ষণের ফজিলত ও পরিত্যাগ করার ভয়াভহতা বর্ণিত হয়েছে? বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন যদি খারাপ হয়, কেন ফারসী ও উর্দু ভাষায় দক্ষতা অর্জন? কোরআন কি মাতৃভাষা শিক্ষার নির্দেশ দেয় না? ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা অর্জন যদি অবৈধ হয় কেন রাসূল (স.) ইবনে সাবেত(রাযি.) কে এক বর্ণনায় হিব্রু ও এক বর্ণনায় সুরয়ানী ভাষা শিখতে বলেছিলেন? কেন আজকের প্রধানমন্ত্রী জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে? কেন আজকের মন্ত্রী পরিষদ জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে? ইসলাম যদি অর্থব্যবস্থা সমর্থন করে, তাহলে কেন আজকের অর্থব্যবস্থা সেক্যুলারদের হাতে? জাগতিক শিক্ষা প্রয়োজন না হলে কেন মামলা-মোকদ্দমায় বৃটিশ প্রণোদিত শিক্ষাব্যবস্থার ধ্বজাধারীদের কাছে ধর্ণা দিতে হয়? জাগতিক শিক্ষা দুনিয়া দুনিয়া বলে গলা ফাটালেও কেন অসুস্থ হলে জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ডাক্তারের কাছে দৌড়ান? পারেন না মাদরাসার গন্ডিতে আবদ্ধ থাকতে? চিকিৎসার জন্য ইন্ডিয়া-সিঙ্গাপুর কেন? জাগতিক শিক্ষা জরুরি না হলে কেন কাফেরদের বানানো প্রযুক্তি ব্যবহার করেন? দেখুন না মোবাইল-বিদ্যুৎ ইউজ না করে, গাড়িতে না চড়ে, বিমানে না উড়ে থাকতে পারেন কিনা? এ গুলো কিছুই ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে আসে নি। সব জাগতিক শিক্ষার ফসল। এ রকম আর কয়টি বলব? এমন কোনো ডিপার্মেন্ট নাই, যেখানে আমরা জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের সরনাপন্ন হচ্ছি না।

তাহলে কেন দুনিয়া দুনিয়া বলে এটিকে পিছনে ফেলে রাখা? কেন মুখের কথাকে কাজে পরিণত না করা? এড়িয়ে যেতে পারবেন না। সম্ভব না। তাই সাথে নিয়ে চলুন। আমাদের একদল এমন তৈরি করুন। কলেজ-বিশ্ব বিদ্যালয়ের এ শিক্ষাকে নিজেদের আদলে সাজিয়ে নিন। সব ধরণের আধুনিক ও অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের সজ্জিত করুন। দেখবেন, আপনাদের অধীনে আমরাই সাজাব ইমাম মাহদীর প্রতীক্ষিত দুনিয়া। প্রশ্ন হলো আদৌ কি এ শিক্ষাব্যবস্তায় এমন বিপর্যয় বিদ্যমান? এর উত্তরে কে কী বলবে জানি না। তবে আমার সাফ কথা — আদৌ এ শিক্ষাব্যবস্থায় এমন বিপর্যয় বিদ্যমান। তারপরও প্রতিষ্ঠালগ্নের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রতিষ্ঠাতাদের এমন উদ্দেশ্য ছিল না। তাই বাস্তববাদীরা বসে থাকেন নি। চালিয়ে গেছেন নিজেদের সাধনা। "এ উম্মাহকে দু'টি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে— জিহাদ ও ইজতিহাদ"। জিহাদ মানে সবাই বুঝি। যাকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি। আর ইজতিহাদ মানে শরয়ী না। আধুনিক ও অত্যাধুনিক, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের সকল শাখায় পান্ডিত্য অর্জন। আলী মিয়া নদবী(রহ.) র উক্তি। পরিশেষে ইমাম মালেক (রহ.) র উক্তি স্বরণ করিয়ে দিতে চায়। "এ উম্মাহর সফলতা সে পথেই যে পথে সফল হয়েছেন পূর্বসূরিরা"।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪০৭০

হায়দারাবাদ : ভুলে যাওয়া ইতিহাস

[alihasan](#)

Junior Member

০৯-১৮-২০১৯

১৯৪৮ সালের এইদিনে ভারতের কাছে স্বাধীনতা হারিয়েছিল মুসলিম হায়দারাবাদ মুঘল সেনাবাহিনীর একজন প্রভাবশালী সেনাপতি ছিলেন মীর কমরউদ্দিন খান আসফজাহ। তুর্কি বংশোদ্ভূত এই সেনাপতি হায়দ্রাবাদ রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।

বিখ্যাত মুঘল সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেব ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে মীর কমরউদ্দিন খান আসফজাহকে নিজামুল মুলক উপাধি দেন এবং তাকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করেন। আরো পরে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হায়দারাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং হায়দারাবাদ একটি স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। ৮২,৬৯৮ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে সুবিশাল এই রাজ্যের শাসককে নিজাম বলে সম্বোধন করা হত।

হায়দ্রাবাদের প্রথম নিজাম মীর কমরউদ্দিন খান আসফজাহের মৃত্যুর পর তার মেয়ের ঘরের নাতি (খায়রুন্নেসা বেগমের পুত্র) মুজাফফর জঙ্গ এবং তার পুত্র নাসির জঙ্গের (১৭৪৮–৫০) মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ হয়। ঠিক সে সময়ে ভারতবর্ষে বহিরাগত ফরাসী ও ইংরেজ ব্যবসায়ীদের ভিতরে পরস্পর প্রাধান্য বিস্তারের লড়াই চলছে। সে সময় ইংরেজ ব্যবসায়ীরা নিজামের পুত্র নাসির জঙ্গের পক্ষ নেন আর ফরাসীরা পক্ষ নেন নিজামের নাতি মুজাফফর জঙ্গের। বিবাদ যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়। মুজাফফর জঙ্গ পরাজিত হয়ে মামার সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হন। কিন্তু দুই বছরের মাথায় আততায়ীরা নাসির জঙ্গকে হত্যা করে।

তখন মুজাফফর জঙ্গ নিজেকে স্বাধীন নিজাম ঘোষণা করে ক্ষমতা দখল করেন। ফরাসী গভর্ণর ডুপলিক্সকে তিনি রাজ্যের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দান করেন। রাজপরিবারের অন্তর্দন্দের সুযোগ নিয়ে হায়দ্রাবাদের শাসন ক্ষমতায় এভাবেই প্রথমবারের মতো বিদেশীদের প্রভুত্ব এবং প্রভাব অনুপ্রবেশ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ইংরেজরাও বসে ছিলনা। ফরাসীদের অনুগত মোজাফফর জঙ্গের বিরূদ্ধে ইংরেজরা (প্রথম নিজাম আসফজাহের চতুর্থ পুত্র) মীর নিজাম আলি খানকে (১৭৬২–১৮০৩) হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে বসতে সহায়তা করে। তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ শেরে মহিশূর টিপু সুলতানের সাথে যখন ইংরেজদের যুদ্ধ হল সে যুদ্ধে হায়দ্রাবাদের এই মীর নিজাম আলী টিপু সুলতানের বিরূদ্ধে ইংরেজদের সহযোগিতা করেন। এ ঘটনার পর ভারতের স্বাধীনতাকামী মানুষ "বিশ্বাসঘাতক" নিজাম ও হায়দ্রাবাদের উপর এতটাই ক্ষুব্ধ হন যে, ১৯৮৪ সালে যখন ইন্ডিয়া হায়দ্রাবাদকে দখল করে নিলো সে সময়ে অনেক মানুষ ছিলেন যারা হায়দ্রাবাদের প্রতি কোনো সহানুভূতি দেখান নি।

ভারতের স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত যখন চূড়ান্ত হয়ে গেল তখন ভারতে ৫৬২ টি দেশীয় রাজ্য ছিল, যেগুলি ব্রিটিশ সরকারের সাথে বিশেষ চুক্তি বা ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত হত। স্বাধীনতার পর দেশ বিভক্ত হলে দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ কি হবে, তা একটি বড় প্রশ্ন হয়ে উঠল।

১৯৪৭ সালে প্রণীত ভারত স্বাধীনতা আইনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল:

১৯৪৭–এর ১৪ আগস্টের পর দেশীয় রাজ্যগুলির উপর থেকে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ অবসানের পর এই রাজ্যগুলো নিজেদের ইচ্ছামত ভারত বা পাকিস্তান যেকোনো ডোমিনিয়নে যোগ দিতে পারবে অথবা যদি তারা চায় তাহলে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকতে পারবে।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের এই নীতি অত্যন্ত ন্যায়ানুগ ও বাস্তবসম্মত ছিল। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষ করে নেহেরুর বন্ধু এবং কংগ্রেসের চিন্তার সংগে একাত্ম স্বয়ং ভাইসরয় মাউন্ট ব্যাটেনের ষড়যন্ত্রে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

১৯৪৭ এর ২৫ জুলাই মাউন্ট ব্যাটেন দেশীয় রাজাদের একটি বৈঠক আহবান করেন সেখানে তিনি দেশীয় রাজাদের সরাসরি মুখের উপর ভারতে যোগ দিতে বলে দেন। মাউন্ট ব্যাটেনের হুমকিতে দেশীয় রাজাদের অধিকাংশই ১৫ আগস্টের পূর্বেই ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। যারা স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন তাদের জন্য ভিন্নপথ অবলম্বন করা হয়। যেমন, ত্রিবাঙ্কুর, যোধপুর, ভূপাল (যার নবাব ছিলেন মুসলমান) ভারতে যোগ দিতে অসম্মতি

জানায় তখন কংগ্রেস ঐ সমস্ত রাজ্যে তাদের কর্মীদের দ্বারা গোলযোগ তৈরী করে রাজ্যগুলোক ভারতে মিশে যেতে বাধ্য করে। ফলে ১৯৪৭ এর ১৫ আগস্টের পূর্বেই হায়দারাবাদ, জুনাগর ও কাশ্মীর ছাড়া ভারতের প্রত্যাশিত সকল রাজ্যই ভারতে অন্তর্ভূক্ত হতে বাধ্য হয়।

জুনাগরের নবাব ছিলেন মুসলমান কিন্তু জনগণের বেশীরভাগ ছিলেন হিন্দু ও কংগ্রেস সমর্থক। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট জুনাগরের নবাব পাকিস্তানে যোগদানের কথা ঘোষণা করার সাথে সাথেই কংগ্রেস কর্মীরা দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরী করে এবং ভারতীয় সৈন্যরা জুনাগর ঘেরাও করে ফেলে। নভেম্বরে ভারতীয় সৈন্য জুনাগরে প্রবেশ করে এবং দেশটি দখল করে নেয়। পাকিস্তানে যোগদানকারী কোনো রাজ্যে সেনা সমাবেশ ঘটিয়ে রাজ্য দখল করে নেওয়ার সেটাই ছিল ভারতের প্রথম পদক্ষেপ। জুনাগর দখলে ভারতের অজুহাত ছিল, সেখানকার বেশীরভাগ জনগণ হিন্দু এবং তারা ভারতে যোগ দেওয়ার পক্ষপাতি কিন্তু কাশ্মীরের বেলায় ভারত সেই অজুহাত মানতে রাজি হয়নি।

কাশ্মীরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে, কাশ্মীরের জনগণ গণভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবে তারা পাকিস্তানে না ভারতে থাকবে। ১৯৪৭ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এক বেতার ভাষণে বলেছিলেন, "গণভোটের যে শর্তে কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ভারত অবশ্যই সে শর্ত পূরণ করবে।"

এর আগে ১৯৪৭ সালের ৩১ অক্টোবর জওহরলাল নেহেরু পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরীত এক বার্তায় বলেছিলেন, "আমাদের এই প্রতিশ্রুতি শুধু আপনার সরকারের কাছে প্রদত্ত ওয়াদা মাত্র নয়, বরঞ্চ এটা কাশ্মীরের জনসাধারণ এবং সেটা সারা দুনিয়ার প্রতি আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।"

কিন্তু গণভোট আর হয়নি। কাশ্মীরকে জোর করে ভারত দখল করে নেয়। এরপর বাকি ছিল কেবল হায়দ্রাবাদ। রাজ্যটি ছিল আয়তনে বাংলাদেশের চেয়েও বড়। শুধু আয়তনের দিক থেকে নয়, সম্পদ, সমৃদ্ধি সামর্থের দিক থেকেও একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকার সকল সম্ভাবনাই হায়দ্রাবাদের ছিল। হায়দ্রাবাদের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ছিল। নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থা ছিল। সেনাবাহিনী ছিল। আইন আদালত ছিল। বিচার ব্যবস্থা ছিল। হাইকোর্ট ছিল। শুল্ক

বিভাগ ছিল। নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়, পতাকা, ভাষা, জাতীয় সঙ্গীত, বিভিন্ন দেশে নিজেদের রাষ্ট্রদূত ও জাতিসঙ্ঘে নিজস্ব প্রতিনিধি ছিল।

১৯৩৫ সালের গভর্নমেন্ট অব ইনডিয়া এ্যক্টে হায়দ্রাবাদকে স্বাধীন মর্যাদা দিয়ে বলা হয়েছিল, দেশীয় রাজ্যগুলির পদমর্যাদা ও স্বাভাবিক কার্যাবলী রাজ্যগুলোর অনুমতি ব্যতীরেকে ভারতের কাছে হস্তান্তর করা যাবে না।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসের নয় তারিখে হায়াদ্রাবাদের নিজাম মাউন্ট ব্যাটেনকে লেখা এক পত্রে বলেন, "ব্রিটিশ সরকার ও হায়দ্রাবাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী হায়দ্রাবাদ স্বাধীন থাকতে চায়। আমরা ভারত বা পাকিস্তান কারো সাথেই যোগ দেবনা।" মাউন্ট ব্যাটেন পত্রটি ব্রিটিশ রাজের কাছে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি চিঠিটি আর ব্রিটেনকে পাঠান নি। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষিত হল। ১৫ আগস্ট মাউন্ট ব্যাটেনকে গভর্ণর জেনারেল রেখেই ইন্ডিয়ার স্বাধীনতা ঘোষিত হল। সে দিনই হায়দ্রাবাদ স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে ইন্ডিয়ার সাথে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কেমন হবে তা নির্ধারণের আগ পর্যন্ত ইন্ডিয়া ও হায়দ্রাবাদের মাঝে একটি নিষ্ক্রিয়তামূলক চুক্তি স্বাক্ষর হয়। হায়দ্রাবাদে কিছু হিন্দু সংগঠন ছিল এরা ভারতের মূল হিন্দু সংগঠনের শাখা। তাদের অর্থ ও নির্দেশনা সীমান্তের ওপার থেকে আসত। আর ছিল কিছু চরমপন্থী বাম হিন্দু সংগঠন।

হায়দ্রাবাদে অরাজক পরিস্থিতি তৈরী করতে ইন্ডিয়ার পরিকল্পনায় এই সংগঠনগুলো ভূমিকা রাখে। সংগঠনগুলোর আশ্রয়ে সীমান্তের ওপার থেকে হাজার হাজার লোক হায়দারাবাদে অনুপ্রবেশ করে।

এরা রাজনৈতিক নেতাদের গুপ্তহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ এবং সীমান্ত রক্ষীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। পরিস্থিতি ক্রমেই হায়দ্রাবাদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যায়। পরিস্থিতির নাযুকতা বুঝতে পেরে সাধারণ মুসলমানগণ শেষ সময়ে এসে কিছু করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। প্রথমে বাহাদুর ইয়ার জং এবং তার মৃত্যুর পর কাসিম রিজভির নেতৃত্বে ইত্তেহাদুল মুসলিমিন গঠিত হয়। অরাজক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন ব্যর্থ হয় কিন্তু অল্প সময়ের ভিতরে ইত্তেহাদের স্বেচ্ছাসেবকরা হায়দ্রাবাদে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনেন।

তবে ভারতীয় মিডিয়া বিশেষ করে হিন্দুস্তান টাইমস ইত্তেহাদের পদক্ষেপগুলোকে সাম্প্রদায়িক বলে প্রচার করতে থাকে। হিন্দু বামপন্থী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর বিরূদ্ধে যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হত সেগুলোকে হিন্দুদের উপর জুলুম–নির্যাতনের সাম্প্রদায়িক কাহিনী বানিয়ে সমস্ত পত্রিকাগুলো প্রপাগান্ডা শুরু করে। অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু লোককে ভারতে আনিয়ে তাদেরকে শরণার্থী সাজানো হয়। প্রচার করা হয়, হায়দ্রাবাদে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এতটাই অবনতি হয়েছে যে সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আর বসবাস করতে পারছে না। এই সাজানো শরণার্থীদের পুঁজি করে আরো প্রপাগান্ডা চালানো হয় যে হায়দ্রাবাদে হিন্দুদের জান–মালের কোনো নিরাপত্তা নেই।

কিন্তু ইত্তেহাদের প্রতিরোধের প্রভাবে ইন্ডিয়া শেষ পর্যন্ত হায়দরাবাদের সাথে একটা স্ট্যান্ডস্টীল চুক্তি করতে বাধ্য হয়। এই চুক্তিতে তারা হায়দারাবাদের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়। বিনিময়ে ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে শর্ত দেওয়া হয় যে, আগামী এক বছর হায়দ্রাবাদ তার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবে না এবং পাকিস্তানে যোগ দিতে পারবে না।

৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরে রিজার্ভ ব্যাংকের অংশ হিসাবে ইন্ডিয়ার নিকট পাকিস্তানের ৫০ কোটি টাকা পাওনা ছিল। দেশ ভাগের পর এই টাকা দিতে ভারত অস্বীকার করে। ফলে সদ্যোসৃষ্ট পাকিস্তান অর্থ সংকটে পরে অস্তিত্ব হারাতে বসে। পাকিস্তানের সেই দুঃসময়ে হায়দ্রাবাদ পাকিস্তানকে ২০ কোটি টাকা ঋণ দিয়ে সাহায্য করে। পাকিস্তানকে ঋণ দানের এই ঘটনাকে ভারত চুক্তি খেলাপের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে হায়দারাবাদের বিরূদ্ধে অবরোধ আরোপ করে।

জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, আমরা যখন প্রয়োজন মনে করব তখনই হায়দারাবাদের বিরূদ্ধে সেনা অভিযান পরিচালনা করব।" সে সময় নেহেরুর এই উক্তিকে হিটলারের মানসিকতার অনুরূপ বলে মন্তব্য করেছিলেন উইনস্টন চার্চিল।

কায়েদে আজম মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মৃত্যু বরণ করেন। এর দু'দিন পর ১৩ সেপ্টেম্বর ইন্ডিয়া প্রথমে প্রকাশ করে যে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হায়দ্রাবাদের প্রশাসনকে সহযোগিতা করতে তারা হায়দ্রাবাদে কিছু পুলিশের সদস্য পাঠাচ্ছে। পুলিশের কথা বলে ৩৫ হাজার প্রশিক্ষিত সেনার একটি বহর পাঠানো হয়। সেনা বাহিনী আর্টিলারি, এয়ার সাপোর্ট

এবং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আচমকা হায়দ্রাবাদ আক্রমণ করে। ভারতীয় জেনারেল জয়ন্ত নাথ চৌধুরী এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন। জেনারেল জয়ন্ত নাথের দাদার বাড়ি বাংলাদেশের পাবনা জেলায়। অভিযানের নাম দেওয়া হয় অপারেশন পোলো। মাত্র ২৪০০০ সেনা যার মধ্যে মাত্র ছয় হাজার সেনা ছিল ছিল পুরাতন আমলের অস্ত্রে সজ্জিত। এই সেনাবাহিনী নিয়ে হায়দ্রাবাদ ইন্ডিয়ার বিরূদ্ধে এক অসম প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে।

সপ্তম নিজাম মীর উসমান আলি খান আসফজাহ ছিলেন হায়দ্রাবাদের শেষ নিজাম। টাইম ম্যাগাজিনের মতে সে সময়ে বিশ্বের শীর্ষ এই ধনী শাসকের রাজ্যে নিজস্ব এয়ারলাইনস, রেল ও নৌ ব্যবস্থা ছিল। অপারেশনের শুরুতেই নিজামকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে ভারতীয় বাহিনী ব্যাপক গণহত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাটের আশ্রয় নেয়। নিরপেক্ষ জরিপে মাত্র পাঁচদিনে দুই লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করা হয়।

সুন্দরলালের নেতৃত্বে কংগ্রেসের যে কমিটিকে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু হায়দ্রাবাদে ইন্ডিয়ান সেনা বাহিনীর গণহত্যা তদন্তের জন্য পাঠিয়েছিলেন সে কমিটি ৪০ হাজার মুসলমানকে হত্যার কথা উল্লেখ করেছে। তারা বলেছে পুরুষদের প্রথমে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হত এবং ঘরে ঘরে যেয়ে মহিলাদের গণ ধর্ষণ করে তাদেরও হত্যা করা হত। তবে রিপোর্টটি ২০১৩ সালে সর্বপ্রথম জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়।

১৯৪৮ সালের ২৬ নভেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরু তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাটেলকে এক নোট লিখে বলেছিলেন, "তিনি হায়দ্রাবাদে এত বেশি মুসলিম হত্যার বিবরণ পাচ্ছেন যে, তাতে তার ধারণার ভিত কেঁপে গেছে। সেখানে মুসলিমদের সম্পদহানীর খবরও ভয়াবহ।" হায়দ্রাবাদের নিজাম পাকিস্তান, আমেরিকা এবং জাতিসংঘের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানান। কিন্তু তিনি কোনো সাড়া পাননি। অবশেষে ব্যাপক সম্পদ ও জীবনহানি এড়ানোর জন্য ছয়দিনের মাথায় তিনি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ১৯৪৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর হায়দ্রাবাদের সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল আল ইদরুস (যার বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন আছে) ভারতীয় বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল জয়ন্ত নাথ চৌধূরীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেন। এরপর জাতিসংঘে ভারতের বিরূদ্ধে যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল তাও হায়দারাবাদ প্রত্যাহার করে নেয়। আত্মসমর্পণের পর ইন্ডিয়া

হায়দ্রাবাদ রাজ্যকে ভেঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যের সাথে মিলিয়ে দেয়। বিশ্লেষকরা মনে করেন ইন্ডিয়ার রাজ্য দখলের তৃষ্ণা হায়দ্রাবাদেই সমাপ্ত হয়ে যায়নি। কারণ কংগ্রেস কখনো দেশ বিভাগকে মেনে নেয়নি। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল ইন্ডিয়ার একচ্ছত্র দখলে নিয়ে আসা হল নেহেরুর ডকট্রিন। নেহেরুর এই ডকট্রিনে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল বিশ্বাস করে।

"মহাত্মা" গান্ধী বলেছিলেন, "যতই রক্তপাত হোক এক ইঞ্চি পাকিস্তানও আমি সমর্থন করবো না। তিনি বলতেন: "If india leads a blood bath, she shall have it." ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল বলতেন, "আজ হোক কাল হোক আমরা আবার এক হব এবং বৃহৎ ভারতের প্রতি আনুগত্য দেখাব।" ভারতের কোনো কোনো প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীর মন্তব্যে বোঝা যায় ভারতের হিন্দুরা সামাজিক বৈচিত্র্যে বিশ্বাস করে না । বৈচিত্রহীন এক রঙ্গের গেরুয়া হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই হল ভারতের চূড়ান্ত গন্তব্য।

রবার্ট নারায়ন তার দ্য স্টেটসম্যান অব ইন্ডিয়া গ্রন্থে লিখেছেন, "বাল গঙ্গাধর তিলক বলেন, 'এই উপমহাদেশের মুসলমান অধিবাসীরা হল বিদেশী দখলদার, কাজেই তাদের শারীরিক ভাবেই নির্মূল করতে হবে"।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও শক, হুন, পাঠান, মোগলকে "এক দেহে" লীন করার সাম্প্রদায়িক প্রস্তাব দিয়েছেন। কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য্য কৃপালণী বলেছিলেন, "কংগ্রেস অথবা সমগ্র ভারতীয় জাতি কখনোই অখণ্ড ভারতের দাবী পরিত্যাগ করবে না।"

কংগ্রেসের ইচ্ছা ছিলো ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর তারা একচ্ছত্র ভাবে মুসলমানদের শাসন করার অধিকার পাবে। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়াতে কংগ্রেসের এই ইচ্ছা পূরণ হয়নি। গান্ধী ও অন্যান্য হিন্দু নেতা সম্পর্কে মোহাম্মাদ আলি জিন্নাহ বলতেন, "গ্রেট ব্রিটেন ইন্ডিয়া শাসন করতে চায়। মি. গান্ধী ও তার কংগ্রেস মুসলমানদের শাসন করতে চায়। আমরা বলি, ব্রিটিশ অথবা মি. গান্ধী কাউকেই মুসলমানদের উপর শাসন করতে দিবো না।"

বাংলাদেশ সম্পর্কে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল বলেছিলেন, "পূর্ব বাংলা (বাংলাদেশ) অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কোনো ভাবেই অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে না, আজ হোক কাল হোক আমাদের সাথে তাকে মিলতেই হবে।"

বিশেষত পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হওয়ার পরে এবং সাম্প্রতিক আসামের বাংলাভাষি মুসলমানদের ভারতীয় নাগরিকত্ব বাতিল এবং তাদেরকে বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যাপারে আলোচনা ওঠার পর সর্ব ভারতীয় হিন্দু নেতা সাভারকারের একটি মন্তব্য সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৭ সালের ৫ এপ্রিল হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে তারকেশ্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে সাভারকর বলেছিলেন, "প্রথমত: পশ্চিমবঙ্গে একটি হিন্দু প্রদেশ করতে হবে। দ্বিতীয়ত: আসামে বসবাসকারী সমস্ত মুসলিমকে আসাম থেকে বিতাড়ন করতে হবে। এরপর পূর্ব পাকিস্তানকে (বাংলাদেশকে) দুই হিন্দু প্রদেশের মাঝে ফেলে পিষে মারতে হবে। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিবেশি দেশগুলো সম্পর্কে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির গূঢ়তত্ত্ব বুঝতে আরো একটা তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন।

পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে ভারতের প্রাচীন রাজনৈতিক পরামর্শক কৈটিল্যের কিছু উপদেশ আছে। ভারতে যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তাদের নিকট ভারতের হিন্দু রাজাদের প্রাচীন রাজনৈতিক উপদেষ্টা কৈটিল্যের উপদেশগুলো ঐশ্বরিক বাণীর মত অনুসরণীয়। প্রতিবেশি রাষ্ট্র সম্পর্কে তার কয়েকটি পরামর্শ হল:'সকল সীমান্তবর্তী রাজ্যকে শত্রু মনে করবে।'

'ক্ষমতার লোভ এবং অন্য দেশ বিজয়ের আকাঙ্ক্ষাকে কখনো মন থেকে মুছে যেতে দিবেনা।'

'প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে।'

'সারা পৃথিবী চাইলেও তুমি নিজে শান্তির কথা চিন্তাও করতে পারবে না।' ইনসাফ টোয়েন্টিফোর ডটকম |

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪২২০

সাইফুদ্দিন কুতজ রহ. কি খলিফা ছিলেন?

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১২-০৩-২০১৯

উত্তর : না! তিনি সুলতান ছিলেন। খলিফা ছিলেন না। তিনি মূলত মিশরের সুলতান ইজ্জুদ্দীন আইবেকের গোলাম এবং সবচেয়ে ঘনিষ্ট গোলাম ছিলেন। ৬৫৫ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে ইজ্জুদ্দীন আইবেক তার বিবি ও খাদেমাদের হাতে নিহত হন। বদলাস্বরূপ কুতজ রহ. এর নেতৃত্বে আইবেকের অন্যান্য গোলামরা বিবিকে হত্যা করেন এবং আইবেকের অল্পবয়স্ক ছেলে নূরুদ্দীন আলীকে ক্ষমতায় বসান। অল্পবয়স্ক বালকের পক্ষে রাষ্ট্র চালানো সম্ভব ছিল না। তাই সকল বিষয় মূলত কুতজ রহ.-ই দেখাশুনা করতেন। তিনি আগে থেকেই এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং লোকজন তাকে মান্য করতো। এভাবে দুই বছর চলে।

৬৫৭ হিজরিতে তাতাররা শামে আগ্রাসন চালায় এবং মিশরে আগ্রাসন চালানোর পরিকল্পনা করে। পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী জিহাদ অনিবার্য হয়ে পড়ে। তখন কুতজ রহ. তার মুনীবের ছেলে নূরুদ্দীন আলীকে অপসারণ করে নিজে সুলতান পদে অধীষ্ঠিত হন। কারণ, অল্পবয়স্ক বালকের পক্ষে এ ধরণের ভয়াবহ পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব ছিল না। তখনকার উলামা, ফুকাহা ও উমারাগণও বিষয়টি মেনে নেন। বরং কুতজ রহ. এর ক্ষমতা গ্রহণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত ছিল। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করে জিহাদে রওয়ানা হন। আল্লাহ তাআলা তার হাতে তাতারদের নাস্তানুবাদ করেন। আলহামদুলিল্লাহ।

আরেকটু বিস্তারিত বললে- ৬৫৬ হিজরির সফর মাসে বাগদাদে আব্বাসী খলিফা মু'সিম বিল্লাহ তাতারদের হাতে শহীদ হন। তাতাররা বাগদাদকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে। বলা হয়, বাগদাদে তারা বিশ লাখ মানুষ হত্যা করে। তখন থেকে মুসলিম বিশ্ব খলিফা শূন্য হয়ে পড়ে। তিন বছর খলিফাশুন্য ছিল।

তাতাররা বাগদাদ ধ্বংসের পর শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। হালাব ও দামেশককেও বাগদাদের মতো মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে। শামের আমীর-উমারা ও জনগণ মিশরের কাছে সাহায্য চান, যেন শাম ও মিশর মিলে তাতারদের প্রতিহত

করা যায়। এ ঘটনা ৬৫৭ হিজরির। তখন মিশরের ক্ষমতায় অধীষ্ঠিত- ইজ্জুদ্দিন আইবেকের ছেলে নূরুদ্দীন আলী। তাতারদের ব্যাপারে আলোচনার জন্য মিশরে আমীর-উমারা ও উলামা-ফুকাহা মিলে এক মজলিস বসে। সময়ের দাবি অনুযায়ী জিহাদের সিদ্ধান্ত হয়। তবে অল্প বয়স্ক বালকের পক্ষে এ ধরণের নাজুক পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব ছিল না। মূলত আগে থেকে কুতজ রহ.-ই রাষ্ট্রীয় বিষয়াশয় দেখাশুনা করতেন। লোকজনের মাঝে নূরুদ্দীন আলীকে বরখাস্ত করার আলোচনা উঠে। কুতজ রহ.-ই ছিলেন এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য উপযুক্ত লোক। তিনি নূরুদ্দীন আলীকে বরখাস্ত করে মিশরের সুলতান পদে অধীষ্ঠিত হন। ৬৫৭ হিজরির জিলকদ মাসে তার বাইয়াত হয়। উলামা-ফুকাহাগণও পরিস্থিতির বিবেচনায় এতে সমর্থন দেন। সুলতান পদে অধীষ্ঠিত হয়ে তিনি শাম ও মিশরবাসীকে নিয়ে জিহাদে রওয়ানা হন। আমীর রুকনুদ্দীন বাইবার্স রহ. শামের বাহিনিতে ছিলেন। তিনি কুতজের সাথে যোগ দেন। ৬৫৮ হিজরির রমযান মাসে আইনে জালূতে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে তাতাররা সূচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। আল্লাহ তাআলা কুতজ রহ. এর হাতে তাতারদের নাস্তানুবাদ করেন। আলহামদুলিল্লাহ।

শাম তাতারদের থেকে মুক্ত হওয়ার পর কুতজ রহ. মিশরে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে কয়েকজন আমীরের ষড়যন্ত্রে তিনি নিহত হন। এরপর সকলে মিলে ইসলামের সিংহ রুকনুদ্দীন বাইবার্স রহ.কে মিশর ও শামের সুলতান নির্ধারণ করে। তিনি সুলতান হওয়ার পর ৬৫৯ হিজরির রজব মাসে মুস্তানসির বিল্লাহ আব্বাসীকে খলিফা নিয়োগ দেন। এভাবে তিন বছর মুসলিম বিশ্ব খলিফাশুন্য থাকার পর ৬৫৯ হিজরিতে খলিফা নিয়োগ হয়। এ খলিফাবিহিন সময়েই ৬৫৮ হিজরির রমযান মাসে সুলতান কুতজ রহ. আইনে জালূতের জিহাদে তাতারদের পরাজিত করে ইসলামের বিজয় ছিনিয়ে আনেন।

বিষয়টি ভালভাবে জানার জন্য কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি-

ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪ হি.) বলেন,

ثم دخلت سنة ست وخمسين وستمائة فيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة، و انقضت دولة بني العباس منها. اهـ

“৬৫৬ হিজরিতে তাতাররা বাগদাদ দখল করে নেয়। বাগদাদের অধিকাংশ অধিবাসীকে হত্যা করে দেয়, এমনকি খলিফাকেও। সাথে সাথে বাগদাদ থেকে আব্বাসী শাসনেরও পতন হয়ে যায়।”- **আলবিদায়া ওয়ানিহায়া ১৩/২৩৩**

আরো বলেন,

قتلته التتار مظلوما مضطهدا في يوم الأربعاء رابع عشر صفر من هذه السنة، وله من العمر ستة وأربعون سنة وأربعة أشهر.وكانت مدة خلافته خمسة عشر سنة وثمانية أشهر و أياما (1) ، فرحمه الله وأكرم مثواه، وبل بالر أفة ثراه. وقد قتل بعده ولداه وأسر الثالث مع بنات ثلاث من صلبه، وشغر منصب الخلافة بعده، ولم يبق في بني العباس من سد مسده، فكان آخر الخلفاء من بني العباس. اهـ

“৬৫৬ হিজরির ১৪ই সফর নির্মমভাবে জুলুম করে তাতাররা খলিফাকে শহীদ করে। ... তার শহীদ হওয়ার পর খলিফার পদ শুন্য হয়ে পড়ে। শুন্যতা পূরণ করার মতো আব্বাসীদের কেউ বাকি থাকেনি। (কার্যত) তিনিই আব্বাসীদের শেষ খলিফা ছিলেন।”- **আলবিদায়া ওয়ানিহায়া ১৩/২৩৮**

অর্থাৎ পরে যদিও আব্বাসীদের থেকে খলিফা নিয়োগ দেয়া হয়েছে, কিন্তু খলিফার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। নামে মাত্র ছিল। তাই বলতে গেলে শহীদ মুস্তাসিম বিল্লাহই আব্বাসীদের শেষ স্বাধীন খলিফা।

সুলতান রুকনুদ্দীন বাইবার্স রহ. মিশর ও শামের সুলতান হওয়ার পর ৬৫৯ হিজরির রজব মাসে আব্বাসীদের থেকে মুস্তানসির বিল্লাহকে খলিফা পদে সমাসীন করেন

এ প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

بويع بالخلافة بمصر بايعه الملك الظاهر والقاضي والوزير والأمراء، وركب في دست الخلافة بادیار مصر والأمراء بين يديه والناس حوله، وشق القاهرة في ثالث عشر رجب، وهذا الخليفة هو الثامن والثلاثون من خلفاء بني العباس بينه وبين العباس أربعة وعشرون أبا، وكان أول من بايعه القاضي تاج الدين لما ثبت

نسبه، ثم السلطان ثم الشيخ عز الدين بن عبد السلام ثم الأمراء والدولة، وخطب له على المنابر وضرب اسمه على السكة وكان منصب الخلافة قد شغر منذ ثلاث سنين ونصفا، لأن المستعصم قتل في أول سنة ست وخمسين وستمائة، وبويع هذا في يوم الاثنين في ثالث عشر رجب من هذه السنة - أعني سنة تسع وخمسين وستمائة. اهـ

"মিশরে খলিফার বাইয়াত হয়। সুলতান জাহির (বাইবার্স), কাজি, উজির ও উমারাগণ বাইয়াত হন। ... মিম্বারে খলিফার নামে খুতবা দেয়া হয়। তার নামে মুদ্রাও চালু হয়। ইতিপূর্বে তিন বছরেরও অধিক সময় ধরে খলিফার পদ শুন্য ছিল। কেননা, মুস্তাসিম বিল্লাহ শহীদ হন ৬৫৬ হিজরির শুরুতে আর বর্তমান খলিফার বাইয়াত হয়েছে চলতি ৬৫৯ হিজরির ১৩ই রজব।"- **আলবিদায়া ওয়ানিহায়া ১৩/২৬৮**

বাইবার্স রহ. এর জীবনীতে বলেন,

وهو الذي أنشأ الدولة العباسية بعد دثورها، وبقي الناس بلا خليفة نحوا من ثلاث سنين. اهـ

"পতন হয়ে যাওয়ার পর তিনিই আব্বাসী শাসনকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে তিন বছরের মতো কোন খলিফা ছিল না।"- **আলবিদায়া ওয়ানিহায়া ১৩/৩২৩**

ইবনু তাগরি রহ. (৮৭৪ হি.) বলেন,

وشغرت الخلافة بعده سنين، وبقيت الدّنيا بلا خليفة حتّى أقام الملك الظاهر بيبرس البندقداريّ بعض بنى العبّاس فى الخلافة. اهـ

"খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাহ শহীদ হওয়ার পর কয়েক বছর খলিফার পদ শুন্য পড়ে ছিল। দুনিয়ায় কোন খলিফা ছিল না। অবশেষে সুলতান জাহির বাইবার্স আব্বাসীদের একজনকে খলিফা পদে সমাসীন করেন।"- **আননজুমুয যাহিরা ৭/৬৪**

***

সুলতান কুতজ এবং আইনে জালূত

ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

ثم دخلت سنة خمس وخمسين وستمائة فيها أصبح الملك المعظم صاحب مصر عز الدين أيبك بداره ميتا ... ولما قتل رحمه الله فاتهم مماليكه زوجته أم خليل شجرة الدر به ... ولما سمعوا مماليكه أقبلوا بصحبة مملوكه الأكبر سيف الدين قطز، فقتلوها ...و أقامت الأتراك بعد أستاذهم عز الدين أيبك التركماني، بإشارة أكبر مماليكه الأمير سيف الدين قطز، ولده نور الدين عليا (3) ولقبوه الملك المنصور، وخطب له على المنابر وضربت السكة باسمه. اهـ

"৬৫৫ হিজরিতে মিশরের সুলতান ইজ্জুদ্দীন আইবেক রহ.কে নিজ গৃহে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার মামলূকরা ধারণা করে যে, তার স্ত্রী শাজারাতুতদুর এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত। বড় মামলূক সাইফুদ্দীন কুতজের নেতৃত্বে মামলূকরা শাজারাতুতদুরকে হত্যা করে এবং তারই পরামর্শে আইবেকের স্থলে তার ছেলে নূরুদ্দীন আলীকে 'মানসূর' উপাধী দিয়ে ক্ষমতায় বসায়। তার নামে মিম্বারে খুতবা দেয়া হয় এবং মূদ্রাও চালু হয়।"- **আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১৩/২২৮**

সামনে বলেন,

لما قتل أستاذه المعز قام في تولية ولده نور الدين المنصور علي، فلما سمع بأمر التتار خاف أن تختلف الكلمة لصغر ابن أستاذه فعزله ودعا إلى نفسه، فبويع في ذي القعدة سنة سبع وخمسين وستمائة كما تقدم، ثم سار إلى التتار فجعل الله على يديه نصرة الإسلام كما ذكرنا، وقد كان شجاعا بطلا كثير الخير ناصحا للإسلام وأهله، وكان الناس يحبونه ويدعون له كثيرا. اهـ

"মুনীব নিহত হওয়ার পর কুতজ রহ. মুনীবের ছেলে নূরুদ্দীন মানসূর আলীকে ক্ষমতায় বসান। পরে যখন তাতারদের আগ্রাসনের খবর পান, তার ভয় হয় যে,

মুনীবের ছেলে (সুলতান মানসূর) অল্পবয়স্ক হওয়ায় (উমারাদের মাঝে) মতভেদ দেখা দিতে পারে (যা এ ধরণের পরিস্থিতিতে ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে)। তাই তিনি তাকে বরখাস্ত করেন এবং সকলকে তার হাতে বাইয়াত হওয়ার আহ্বান জানান। ৬৫৭ হিজরির জিলকদ মাসে তার বাইয়াত হয়। বাইয়াতের পর তাতারদের মোকাবেলায় অগ্রসর হন। আল্লাহ তাআলা তার হাতে ইসলামের নুসরত করেন। তিনি অত্যন্ত বীর-বাহাদুর ছিলেন। অনেক ভাল লোক ছিলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণকামী ছিলেন। লোকজন তাকে মহব্বত করতো। তার জন্য অনেক দোয়া করতো।"- **আলবিদায়া ওয়ানিহায়া ১৩/২৬১**

আরো বলেন,

وبان عذره الذي اعتذر به إلى الفقهاء والقضاة وإلى ابن العديم، فإنه قال: لا بد للناس من سلطان قاهر يقاتل عن المسلمين عدوهم، وهذا صبي صغير لا يعرف تدبير المملكة. اهـ

"ফুকাহায়ে কেরাম, কাজিগণ এবং (শামের উজির) ইবনুল আদিম- সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুতজ রহ. পরিস্থিতির বিবেচনায়ই ক্ষমতা হাতে নিয়েছেন। ক্ষমতা নেয়ার যুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এমন একজন দাপটি সুলতান আবশ্যক যিনি দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মুসলমানদের সুরক্ষা দিতে পারেন। আর এ তো ছোট বালক। রাষ্ট্র চালানোর জ্ঞান-বুদ্ধি ও কলা-কৌশল তার জানা নেই।"- **আলবিদায়া ওয়ানিহায়া ১৩/২৫০**

সুলতান পদে অধীষ্ঠিত হওয়ার পর কুতজ রহ. তাতারদের মোকাবেলায় রওয়ানা হন। আইনে জালূতের ঐতিহাসিক যুদ্ধে তাতাররা সূচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তাতাররা শাম থেকেও পলায়ন করে। শাম ও মিশর মুসলমানদের একচ্ছত্র অধীনে চলে আসে। আইনে জালূতের যুদ্ধ হয় ৬৫৮ হিজরির রমযান মাসে। এ সময় মুসলিম বিশ্ব খলিফাশুন্য ছিল। আইনে জালূতের পর মিশরে ফেরার পথে কুতজ রহ. কয়েকজন আমীরের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। সুলতান হওয়ার পর পূর্ণ এক বছরও তিনি ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। এরপর সকলে মিলে রুকনুদ্দীন জাহির বাইবার্স রহ.কে সুলতান নিয়োগ দেন। তিনি সুলতান হওয়ার পর ৬৫৯ হিজরির রজব

মাসে মুস্তানসির বিল্লাহ আব্বাসীকে খলিফা নিয়োগ দেন। তিন বছর খলিফাবিহিন থাকার পর মুসলিম বিশ্বে আবার খলিফা নিয়োগ হয়।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে আশাকরি স্পষ্ট যে, সাইফুদ্দীন কুতজ রহ. খলিফা ছিলেন না, সুলতান ছিলেন। আইনে জালূতে তিনি যে জিহাদ করেছেন, তা খলিফা হিসেবে নয়, সুলতান হিসেবে। এ জিহাদকে উলামায়ে কেরাম আল্লাহর রহমত আখ্যা দিয়েছেন। বুঝা গেল, জিহাদ সহীহ বা জায়েয হওয়ার জন্য খলিফা থাকা শর্ত বা আবশ্যক নয়। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআলা আ'লাম।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৮৭৬

লক্ষ্যহীন জীবন কেবলই এক মরুভূমি

saif abdullah

Moderator

০৯-১৭-২০১৯

পৃথিবীতে খোঁজ নিলে দেখা যায়, সফল মানুষদের সংখ্যা নিতান্তই হাতেগোনা। হাজারো কোটি মানুষের ভীড়ে গুটিকয়েক লোকই সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করতে পারে। আমরা সফলদের নিয়ে কত কথা বলি। তাদের নিয়ে ঈর্ষা করি। তাদের জীবনী ও গল্প শুনে আশ্চর্য হই। আপনি কি মনে করেন, তারা খুব সহজেই এ স্তরে উপনীত হতে পেরেছিলেন? কক্ষনোই নয়; এর পেছনে তাদের প্রচুর ঘাম ঝরাতে হয়েছে। সময়ের ভাষা বুঝে তার আগে আগে চলার কসরত করতে হয়েছে। এভাবেই তারা মানুষের কাতার থেকে উত্তীর্ণ হয়ে চলে গেছেন মহামানবদের কাতারে।

তিক্ত হলেও সত্য যে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ স্বপ্ন দেখে অনেক কিছুরই, কিন্তু জীবন পরিচালিত করে লক্ষ্যহীনভাবে। কারও কারও লক্ষ্য থাকলেও তা স্থির নয়; বরং পরিবেশ, পরিস্থিতি ও কালের চক্রে তা পাল্টে যায়। অথচ যা যুগের আবর্তনে পরিবর্তিত হয়, তা কখনো লক্ষ্য হতে পারে না। লক্ষ্য তো সেটাই যা অর্জনের জন্য জীবনের সবকিছু বিসর্জন দেওয়া যায়। এমন লক্ষ্য নিয়ে কতজন চলে, খুঁজতে গিয়ে ফলাফল প্রায় জিরো পেয়েছি। বেশিরভাগকেই পেয়েছি এমন, যাদের নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য নেই। আর দুয়েকজন যা-ওবা লক্ষ্যের কথা বলেছে, তা আদৌ লক্ষ্য নয়; বরং উপার্জনের মাধ্যমকেই সে জীবনের লক্ষ্য ভেবে বসেছে!

কথাগুলো কেন বললাম? এজন্য যে, আমাদের অনেক ভাই আবেগের ওপর চলতে চান। আবেগ দিয়েই বিশ্বজয় করার ইচ্ছা লালন করেন। আর এ আবেগের সবটুকু আবার অনলাইন নির্ভর। অথচ অনলাইনের দু,চারশ লাইক-কমেন্ট দিয়ে বিপ্লব তো দূরে থাক, একটা সরিষার দানাও কিনতে পারবেন না। এ তো সব মরুর বুকে দেখা মরীচিকার ন্যায়। অনলাইনে অনেক সাপোর্ট পাচ্ছেন, কিন্তু প্রয়োজনের সময় কাছে ডাকলে অধিকাংশকেই খুঁজে পাবেন না। তাই এ মরীচিকার পেছনে জীবনের মূল অংশ ব্যয় করে প্রকৃত লক্ষ্য অর্জন কখনোই সম্ভব নয়। অনলাইন

দাওয়াতের ছোট্ট একটি প্লাটফর্ম মাত্র। কিন্তু আপনার মূল কাজ হতে হবে সব অফলাইনে। অফলাইনের কাজ ছাড়া শুধু অনলাইন এক্টিভিটি আপনার মৃত্যুকূপ স্বরূপ, যেখানে জীবনের সকল অর্জন দাফন হয়।-সংগৃহীত

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪২১৬

সাহাবায়ে কেরাম (রা) দের চট্টগ্রাম সফর এবং বাংলায় ইসলামের আগমন

Ayaz Eymen

Junior Member

০২-১৮-২০১৯

চট্টগ্রাম বিশ্বের সু-প্রাচীন জনপদ সমূহের একটি হিসেবে ঐতিহাসিক ও ভৌগলিকভাবে প্রমাণিত ও স্বীকৃত। এটা বাংলার বাবুল ইসলাম বা ইসলামের প্রবেশ দ্বার হিসাবে খ্যাত। এখানে তিন দিক দিয়ে ইসলামের আগমন ঘটে। প্রথমত: আরব বণিকগণের মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত: "দরবেশ- আউলিয়া" তথা মুজাহিদ, দ্বীনের দায়ীদের মাধ্যমে, তৃতীয়ত: বিজেতাদের মাধ্যমে, এখানে উল্লেখিত তিনটি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

আরব বণিকগণ :

আরব ছিলো খাদ্য ঘাটতির দেশ, তাদের বাধ্য হয়ে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাইরে যেতে হতো। স্বয়ং রাসূল (সা)ও নিজেই এ রকম বেশ কয়েকটি কাফেলায় শরীক ছিলেন। তৎকালীন আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যে আরবদের জুড়ি ছিলোনা। তাদের গ্রীষ্ম ও শীতকালীন বিদেশ যাত্রার কথা কুরআনে কারীমের সূরা কুরাইশে বর্ণিত হয়েছে। আরব ভূ-খন্ড হচ্ছে একটি উপদ্বীপ। তার তিন দিকের স্থল ভাগের অধিকারী ছিল তৎকালীন দুই বৃহৎ পরাশক্তি রোম ও পারস্য, তাদের উপর দিয়ে বাণিজ্য পরিচালনা আরবদের জন্য ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ে। তাই বাধ্য হয়ে সামুদ্রিক পথকে বেছে নিতে হয়। উজানের পানিতে কীভাবে জাহাজ চালাতে হয় এবং জোয়ার-ভাটায় জাহাজ চালানোর পদ্ধতি বিশ্ববাসী আরবদের থেকে শিখেছেন।

আরবদের এই নৌ বাণিজ্যের সময় বঙ্গোপসাগরে চট্টগাম বন্দর ছিল খুবই সুবিধাজক প্রোতাশ্রয়। আরবরা এখান থেকে সুগন্ধি ও মসল্লাজাত দ্রব্যাদি আমদানি করে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করতো। আরবগণ যেমন তাদের বাণিজ্য জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে চষে বেড়াতো, ঠিক তেমনি চট্টগ্রামও তৎকালীন যুগে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য বিশ্ব জুড়ে খ্যাতি সম্পন্ন ছিলো। চট্টগ্রামের তৎকালীন যুগে

নির্মিত জাহাজ অধ্যাবদি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। চট্টগ্রামের নাবিকগণও তাদের জাহাজ নিয়ে বহিঃসমুদ্রে গমন করতেন। ফলে আরবদের সাথে সখ্যতা গড়ে উঠে।

আরবগণ মিশনারী জাতি। যেখানে যেতেন সেখানে বসতি গড়ে তুলতেন। এইভাবে ঐতিহাসিক দলিল ও দস্তাবেজের মাধ্যমে জানা যায় যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এর আগমনের পূর্বেই চট্টগ্রামে আরব বসতি গড়ে উঠে। এমনকি কর্ণফুলী নদীর নামটিও আরবদের দেয়া। আরবীতে করণফুল অর্থ লবঙ্গ। আরবদের লবঙ্গ ভর্তি একটি জাহাজ এই নদীতে নিমজ্জিত হয়েছিল বলেই এ নদীর নাম কর্ণফুলী। আদম (আ) এর নাজিলের স্থান আর হিন্দের প্রতি আরবদের ঝোঁক বরাবরই ছিল। অধিকন্তু তৎকালীন জাহেলী যুগের আরব কবিদের কবিতায় আল হিন্দের কথা এসেছে। কাব ইবনে যোহায়ের ইবনে আবি সালমা যিনি ছিলেন এক আরব কবি এবং পরবর্তীতে আল্লাহর রাসুল (সা) এর একজন সাহাবি হওয়ার সৌভাগ্য অরজন করেন। ইসলাম গ্রহনের পূর্বে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে লিখতেন। পরবর্তীতে তওবা করেন এবং নিজেই ইসলাম গ্রহনের জন্য আল্লাহর রাসুল (সা) এর কাছে আসেন। যেদিন তিনি ইসলাম গ্রহন করলেন সেদিন তাঁর পাঠ করা কবিতাটির কয়েক লাইন ছিল এরকম

"আমি নিজের হাত অকপটে রেখেছি এমন এক ব্যক্তির হাতে, যার রয়েছে প্রতিশোধ গ্রহনের পূর্ণ শক্তি এবং যার কথাই কিনা সবার উপরে। আমাকে বলা হয়েছিল, তোমার নামে এরূপ অরূপ নালিশ রয়েছে আর তোমাকে করা হবে জিজ্ঞাসাবাদ। অথচ নিশ্চয়ই রাসুল (সা) এমন এক নূর, যে নূর থেকে আলো পাওয়া যায়। তিনি আল্লাহর তলোয়ার সমুহের মধ্যে একখানা *হিন্দুস্তানি তলোয়ার।"*

এই কবিতাটি আল্লাহর রাসুল (সা) এর জীবনী আর রাহিকুল মাখতুম সহ আরও অসংখ্য জায়গায় এসেছে। সেই সময়ে হিন্দ তথা হিন্দুস্তান তথা ভারত উপমহাদেশের অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ছিল প্রশংসনীয় যেমন- চন্দন কাঠ, মসলা, সূতী কাপড় ইত্যাদি আরবগণ ক্রয় করে নিয়ে যেতেন। হিন্দের প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থার সুনামের কথাও ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। উপরোল্লেখিত ঐতিহাসিক প্রমাণাদি হতে বুঝা যায় চট্টগ্রাম ও আরব সম্পর্ক বহু প্রাচীন।

দ্রাবিড়দেরকে এ অঞ্চলের প্রাচীন জাতি হিসেবে ধরা হয়। আর্যরা এ অঞ্চলে আসে আফ্রিকান মিশরিয় এলাকা কিনবা গ্রিক বা পারস্য থেকে। এসে এখানকার দ্রাবিড় ও অন্যান্য আদিবাসিদের মেরে কেটে এখানে বাস করা শুরু করে। এক পর্যায়ে এই আর্য তথা হিন্দু পূনর্জাগরণবাদীদের আশুরিক শক্তির দাপটে জৈন ধর্ম বিলুপ্ত প্রায়, বৌদ্ধদের অবস্থা তথৈবচ। ঠিক এই সময় বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে প্রচারিত হয়েছিল সত্য ও সাম্যের ধর্ম ইসলাম। প্রখ্যাত গবেষক গোপাল হাওলাদার বলেন, "বৌদ্ধদের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে রুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণদের শাস্তি দেয়ার জন্য দেবতা নিযুক্ত করলেন। আর এ দেবতা হচ্ছে মুসলমান। ড. ইবনে গোলাম সামাদের মতে ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে পর্তুগীজরা সর্ব প্রথম বাংলায় আসেন। তারা ১৫১৭ সালে চট্টগ্রামে ঘাটি গড়ে তোলেন। পর্তুগীজদের লেখা থেকে আমরা এ দেশের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক উপাদান পাই। প্রখ্যাত পর্তুগীজ পর্যটক জোয়াওদ্য বারোজ লিখেছেন "পর্তুগীজদের চট্টগ্রামে আসার প্রায় একশত বছর পূর্বে একজন সম্ভ্রান্ত আরব যুবক তার একুশ অনুচরসহ দক্ষিণ আরবের এডেন বন্দর থেকে চট্টগ্রামে আসেন। তিনি তার দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। চট্টগ্রামের মুসলমানদের মধ্যে কিছু আরব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, উঁচু গন্তাস্থি বক্র এক নাক এবং উপবৃহত্তকার সংকীর্ণ মুখন্ডল তাছাড়াও অনেকেই আরব উপাধি যেমন শেখ, সৈয়দ ইত্যাদি ধারণ করে। অনেক স্থানের নামের সাথেও আরবী নামের মিল পাওয়া যায়। শোকল বহর, বাকলিয়া, আল করনন ইত্যাদি, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় প্রচুর আরবী উপসর্গ বিদ্যমান। বিশেষ করে ক্রিয়া পদের পূর্বে 'না' সূচক শব্দ ব্যবহার আরবী প্রভাবের ফল। বহুকাল আগে বহু সংখ্যক আরবী বণিক ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভারতের মালাবা, কালিকট ইত্যাদি এলাকায় আগমনের কথা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। যেমন বর্ণিত আছে যে, ***দক্ষিণ ভারতের কেরালার মালাবারের রাজা চেরুমল পেরুমল সিংহাসনে আরোহণের বর্ষপূর্তিতে প্রাসাদের ছাদে উঠলে প্রত্যক্ষ করেন যে, চন্দ্র দ্বি-খন্ডিত হয়ে দুই টুকরা দুই পাহাড়ে পতিত হয়েছে। বিস্মিত রাজা পরে জানতে পারেন যে, আরবে এক নবীর উদ্ভব হয়েছে। অধিবাসিরা তাঁর মুজিজা দেখতে চাইলে তিনি চন্দ্র দ্বি-খন্ডিত করে দেখান। রাজা বিবরণ শুনে স্বয়ং আরবে গিয়ে ইসলাম গ্রহন করেন এবং পরবর্তিতে তাঁর নাম হয়- তাজউদ্দিন (রা)। হাদিসের কিতাবে এই সাহাবিকে "মালিকুল হিন্দ" তথা "হিন্দুস্তানের রাজা" বলা হয়েছে ।*** এ সময়ে বহু সংখ্যক

আরব মালাবারে গমন করেন। তারা প্রায়শই মালাবারের উপর দিয়ে চট্টগ্রাম এবং সেখান থেকে সিলেট কামরূপ হয়ে চীনের ক্যান্টন বন্দরে যাতায়াত করতেন।

ইতিহাসে থেকে দেখা যায় হজরত ঈসার (আ.) জন্মের কয়েক হাজার বছর আগেও দক্ষিণ আরবের সাবা কওমের ব্যবসায়ীরা পালতোলা জাহাজে করে এদেশে আসত। ওই সাবা কওমের নামানুসারে নামকরণকৃত শহর সাবাউর (উর অর্থ শহর) সাবাউর অর্থাৎ সাবাদের শহর আজও ঢাকার অদূরে সাভার নামে পরিচিত হয়ে এদেশে সাবা কওমের আগমন স্মৃতি বহন করছে। এছাড়া বাররুল হিন্দ (ইন্ডিয়ার ভূখন্ড) বা বরেন্দ্র ভূমির কথা তো সর্বজনবিদিত। ঈসায়ী ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাক-ভারত ও বাংলাদেশ উপমহাদেশের ব্যাপকভাবে প্রথম ইতিহাস লেখন মওলানা মিনহাজুদ্দীন সিরাজ উত্তর বাংলাদেশকে 'বাররিন্দ' বলেছেন। যা পরে 'বরেন্দ্র' নামে পরিচিত হয়েছে। এ অঞ্চলকে 'বাররিন্দ্র' বলার কারণ ছিল এই যে, আরবরা বিশাল সমুদ্র, সাগর, মহাসাগর পাড়ি দিয়ে জহাজে ভেসে ভেসে বহুদিন পর বঙ্গদেশে তদানীন্তন হিন্দের মাটি বা স্থল দেখে অনন্দে নেচে উঠে চিৎকার করে বলত 'বাররি হিন্দ' অর্থাৎ হিন্দের মাটি, যা পরবর্তীকাল বাররিন্দ বা বরেন্দ্রতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ট শতাব্দীতে ইরানের সম্রাট সাইরাস (অনেক বলেন ইনি ছিলেন যুলকারনাইন। আল্লাহ আলাম) উপমহাদেশে আর্যদের অন্যতম রাজ্য গান্ধারা জয় করেন। এ সময় তার তাওহীদী জীবন দর্শনের ছটা এ অঞ্চলব্যাপী পরিবাহিত হয়েছিল। যার পরোক্ষ প্রভাব পরবর্তীকালে সংঘটিত ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছিল বলে ধারণা করা হয়।

<u>সাহাবা (রা) গণের চট্টগ্রাম সফরঃ</u>

মহানবী (সা) এর জীবদ্দশায় ইসলাম প্রচারের নিমিত্তে সাহাবায়ে কেরামের (রা) একটি দল হাবশা বা আবিসিনিয়ায় পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি হাবশার বাণিজ্য কেন্দ্রটিকে পূর্ণ মাত্রায় দ্বীন প্রচারে ব্যবহার করতেন। **সাহাবী হযরত আবি ওয়াককাস রা. কিছু সংখ্যক মুসলমানদের নিয়ে সম্রাট নাজ্জাশীর দেয়া একটি জাহাজে করে পূর্ব দিকে সমুদ্র পথে বের হন। তার সাথে ছিলেন সাহাবী হযরত কায়স ইবনে হুযাইফা রা. উরওয়া রা. আবু কায়স ইবনে হারিস রা. ও অন্যান্যদের নিয়ে তাঁরা চীনের পথে রওয়ানা হন।** হযরত আবি ওয়াককাস রা. হযরত আমেনার (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানিতা মাতা) আপন চাচাতো

ভাই। ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম প্রচারকগণ চীনে অবতরণ করেন। তাদের নির্মিত কেয়াংটাং মসজিদ এবং মসজিদের অদূরেই হযরত আবি ওয়াককাসের কবর এখনো চীনা মুসলামানদের জিয়ারতগাহ। **হযরত আবি ওয়াককাসের এ কাফেলা হাবশা হতে চীন আসতে নয় বছর সময় নেয়। পথিমধ্যে অনেক দেশে জাহাজ নোঙ্গর করে। চট্টগ্রাম নিশ্চয় সেই তালিকা হতে বাদ পড়েনি। কারণ এটা জাহাজ চলাচলের জন্য নিরাপদ ট্রানজিট রুট।** ***'মুসলিম জাহান' পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে (৬০৬-৬৪৩ খ্রিঃ) আরব দেশ হতে একটি ছোট্ট প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করতে আসেন।*** তাদের কাথাবার্তা, আচার-আচরণে মুগ্ধ হয়ে এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ ব্যাপকহারে ইসলাম গ্রহণ করেন। ড. কে.এন ভট্টশালী আরাকানী রাজাদের ইতিহাস গ্রন্থ 'রাত জা তু'এ এর নিম্নরূপ একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, "কানরা দজাগীর বংশীয় রাজা সত্য ইঙ্গত চন্দয়ত এর আমলে (৭৮৮-৮১০খ্রিঃ) আরকান উপকূলের রণবী দ্বীপের সংগে সংঘর্ষে কয়েকটি কুল বা বিদেশী জাহাজ বিধ্বস্ত হয়। রাজা জাহাজের মুসলিম আরোহীদের উদ্ধার করে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। এ বর্ণনা থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, যারা আরাকানে গিয়েছিলেন তাঁরা নিশ্চয় চট্টগ্রাম হয়ে গিয়েছিলেন। ***১৯৮৭ সালে রংপুরের লালমনির হাট জেলার মসতের পাড় মৌজায় একটি টিলা খননের সময় একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার হয়। যেখানে কিছু ফলকে স্পষ্ট লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ এবং ৬৯হিজরি লেখা এখানো দেখতে পাওয়া যায়। যারা লালমনির হাটে এসেছিলেন নিশ্চয় তাঁরা বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র পথেই এসেছিলেন। বলা হয়ে থাকে এখানকার মসজিদটি সাহাবি (রা) গণই তৈরি করেছেন। তাঁরা চট্রগ্রাম থেকে রংপুর পর্যন্ত সফর করেন তারপর সিলেট, ভারতের আসাম, মনিপুর হয়ে চীনে প্রবেশ করেন এবং চীনে ইসলামের সুচনা করেন।***

আরবগণ দক্ষিণ চীন সাগর পাড়ি দিয়ে চীনের ক্যান্টন বন্দর, বর্তমান চট্টগ্রাম, প্রাচ্যের জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি বন্দরসমূহে বাণিজ্য করতেন। উপরোক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে আল্লামা জয়নুদ্দীন তাঁর তুহফাতুল মুজাহেদীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মুহাম্মদ (সা) এর যুগে চট্টগ্রামে ইসলাম আসে। হযরত শাহ জালাল রহ. সিলেট বিজয়ের সময় যে বুরহানুদ্দীন ছিলেন তিনি এই আরবদেরই বংশধর। প্রখ্যাত গবেষক ড. হাসান জামান রচিত ও বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য' গ্রন্থে রাসূল (সা) এর যুগে এই অঞ্চলে ইসলাম

প্রচারের কথা নির্দ্বিধায় উল্লেখ করেছেন। মাওলানা আব্দুল হাই লৌক্ষভী স্বীয় গ্রন্থ নুযহাতুল খাওয়াতের ও মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. সহ উপমহাদেশের নামকরা ঐতিহাসিকগণ উপরোক্ত মতের সমর্থনে অনেক তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেছেন। চট্টগ্রামের ঐতিহাসিকদের মাঝে যারা চট্টগ্রামে সাহাবাগণের আগমণের স্বীকৃতি দেননি তাঁরা আবার ঠিক কোন সময়ে এদেশে ইসলাম এসেছে তার ব্যাপারেও সঠিক কোন ধারণা দিতে পারেননি।

"দরবেশ-আওলিয়া" তথা মুজাহিদদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার:

চট্টগ্রামে ইসলামের প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ ও ইসলাম প্রচারে এই আউলিয়া তথা মুজাহিদদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁরা অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তারা অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে মানুষের কাছে ইসলাম প্রচার করতেন এবং তাদের সুন্দর ব্যবহার, চরিত্রের মাধুরতা এতই প্রখর ছিলো যে, তাদের সংস্পর্শে এসে দলে দলে লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে লাগল। চট্টগ্রামকে বার আউলিয়ার দেশ বলা হয়। ১৩৫৩-১৬৬৬ সালকে চট্টগ্রামের ইতিহাসে বার আউলিয়ার যুগ বলা হয়। যদিও বার আউলিয়া বলা হয়, এ অঞ্চলে অলীগণের সংখ্যা অনেক। চট্টগ্রামে দু'টি বার আউলিয়ার দরগাহ পরিলক্ষিত হয়। একটি ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রাক রোডে, অপরটি আরাকান সড়কে পদুয়াতে। কুমিরায় একটি বার আউলিয়ার গ্রাম আছে। যেখানে পাশাপাশি বারটি সমাধিও দেখা যায়।

ড. আব্দুল করীম পটিয়া থেকে উদ্ধারকৃত ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত ৪৪পৃষ্টা ব্যাপী একটি আরবী পান্ডুলিপির কথা তার বইতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেখানকার নামগুলো খুবই অগোছালো। সূঘছড়ীর মাওলানা ইসমাইল কাদেরী (মৃত্যু ১৯২৫) তার কবিতা গ্রন্থ 'গুলশানে ফরজে আবাদী'তে বারজন অলীর নামোল্লেখ করেছেন। কবি মুহাম্মদ খান তার পুথি সাহিত্যে তাঁর মাতৃকূল পিতৃকূলের পরিচয়ে বারজন আউলিয়ার বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে কদল খান গাজী ১১জন মিত্র নিয়ে ইসলাম প্রচার করেন। মোঘল ঐতিহাসিক শাহাবুদ্দীন তালিশ তাঁর গ্রন্থ 'ফতিয়ায়ে ইব্রিয়া'তে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। আউলিয়াগণ এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। বস্তত তাঁদের মাধ্যমে এ অঞ্চল আবাদ হয়েছে। ড. শিহাবুল হুদা 'চট্টগ্রামের দরবেশ ও দরগাহ' শিরোনামে পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন। যাতে চট্টগ্রামের আউলিয়াদের বিস্তারিত

বিবরণ এসেছে, ইহা একটি মৌলিক দলিল। চট্টগ্রামে ভৌগলিক অবস্থান ইসলাম প্রচারের জন্য খুবই সহায়ক ছিল। যাতায়াতের দুর্গমিতার কারণে বিজেতাদের আসতে বিলম্ব হলেও সমুদ্র ও পাহাড় বেষ্টিত অত্যন্ত মনোরম এই ভূখন্ডটি দ্বীনের মুবাল্লিগদের জন্য খুবই সহায়ক ছিল। ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় যে, বনাঞ্চল আবৃত এই ভূখন্ডটি আওলিয়াদের তথা মুজাহিদদের মাধ্যমেই আবাদ হয়। পরবর্তীতে বিজেতাগণ বিজয়ী বেশে আসলে অলীগণ প্রথমত বিজয়ে তাদের সহায়তা করেন এবং বিজয় পরবর্তী নির্বিঘে দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে তোলার কাজ করতেন। এ পর্যায়ে কতিপয় প্রসিদ্ধ "অলী" সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনার আশা রাখিঃ

১. ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামসহ আরো কতিপয় গবেষক ইরানের বিস্তাম শহরের বায়েজীদের চট্টগ্রামে আগমনের কথা উল্লেখ করলেও এর স্বপক্ষে কোন অকাট্য যুক্তি দাড় করাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

২. বদর শাহ : চট্টগ্রামের সর্বাধিক আলোচিত অলি হচ্ছেন বদর উদ্দীন বদরে আলম। মিরাটে তাঁর জন্ম।তিনি সিলেটের হযরত শাহজালালের অনুসংগী ছিলেন। সেখানে তরফের রাজা অচেক নারায়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হাজী খলীলকে সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রামে এসে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি ১৪৪০ সালে ইন্তেকাল করেন। শাহাবুদ্দীন তালিশ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ১৩৪০ সালে চট্টগ্রামে আসেন। প্রখ্যাত মূর পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৪৬/৪৭ সালে চট্টগ্রামে আসেন। তিনিও তার সফরনামায় বদরের উল্লেখ করেন। চট্টগ্রাম, বিহার, আরাকানসহ বিভিন্ন স্থানে বদরের মোকাম থাকায় আসলে তিনি কোথায় সমাহিত তা নিয়ে মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। বেঙ্গল গেজিটিয়ার ও ড. করীসসহ চট্টগ্রামের গবেষকদের ধারণা তিনি চট্টগ্রামেই সমাহিত। কেননা এ দরগাহের নির্মাণশৈলী সুলতানী আমলের। আরবী তুখরা অক্ষরে লিখা একটি শিলালিপি আছে। চাঁটি জ্বালিয়ে তাঁর জ্বীন-পরী তাড়ানো এবং চেরাগী পাহাড় আবাদ ইত্যাদি চমকপ্রদ অনেক জনশ্রুতি আছে, কিন্তু এর ঐতিহাসিক সত্যতা নিরুপণ করা খুবই দুস্কর। কেননা তিনি যে সময়ে চট্টগ্রামে আসেন তখন চট্টগ্রাম এত অনাবাদী থাকার কথা নয়।

৩. মোহছেন আউলিয়া : আনোয়ারায় সমাহিত। তিনি বদর শাহের ভাগ্নে ছিলেন।

৪. মোল্লা মিছকীন : ১৫৬১ সালে ইন্তেকাল করেন। পিতার নাম শায়খ ছারদু মোগলী, সিপাহদারপুর আদি নিবাস। তিনি বিয়ে শাদি করেননি। মহসিন কলেজের দক্ষিণ পাশে পাহাড়ের উপর তাঁর মাজার।

৫. শাহ সূফী আমানত খান : বিহারের অধিবাসী, ১৭৮০/১৭৯৩ সালে চট্টগ্রামে আসেন। জর্জকোর্টে পাখা টানার চাকুরি নেন। ১৮৪৪ সালের পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।

৬. শাহ গরীবুল্লাহ : প্রকৃত নাম রূহুল্লাহ।সম্রাট শাহজাহানের পুত্র দারাশিকোহর ভৃত্য ছিলেন। ভাতৃ সংঘাতে দারা পরাজিত ও বন্দী হলে, তাঁর মালিকের দুর্দশা দেখে তার মন বিগলিত হয়, ফলে সরকারী চাকুরী হতে ইস্তেফা দিয়ে চট্টগ্রামে এসে নাসিরাবাদে খানকাহ প্রতিষ্ঠা করে দ্বীনের কাজ চালিয়ে যান। এখানে চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত চট্টগ্রামের কতিপয় অভিভাবক দরবেশের সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দিলাম। অথচ চট্টগ্রামের প্রতিটি এলাকায় এরকম হাজারো দরবেশ শুয়ে আছেন যারা দ্বীন প্রচারের জন্য এদেশে এসেছিলেন।

৭. মুসলমানদের চট্টগ্রাম বিজয় : বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের ১৫০ বছর পর সোনারগাঁওয়ের স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের (১৩৩৮-১৩৪৯) সেনাপতি কদল খান গাজী উত্তর চট্টগ্রাম মুসলিম শাসনাধীনে নিয়ে আসেন।

৮. ১৩৫৩ সালে চট্টগ্রাম ইলিয়াছ শাহের অধীনে চলে যায়। এ বংশের সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪১০) চীন সম্রাটের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক করেন।

৯. এ সময়ে কয়েকটি চীনা মিশন চট্টগ্রামের ভেতর দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করে এবং বাংলার প্রধান বন্দর হিসেবে চট্টগ্রামের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সুলতান রুকনুদ্দীন বরবক শাহের সেনাপতি রাস্তি খান হাট হাজারী যোবরা গ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরাগল খান ও তৎপুত্র নসরত খান সুলতান হোসেন শাহের পক্ষে চট্টগ্রামের থানাধার ছিলেন। মীরসরাই থানার পরাগলপুর ও পরাগল খানের বিরাট দিঘী ও মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান।

১০. হাবশীদের অত্যাচারে এক পর্যায়ে চট্টগ্রামে মুসলিম শাসন সংকোচিত হয়। কেবলমাত্র তা উত্তর চট্টগ্রামে সীমাদ্ধ ছিল। দক্ষিণ চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের

অধীনে চলে যায়। নসরত খান ত্রিপুরার কবল হতে চট্টগ্রামকে মুক্ত করতে সক্ষম হন এবং চট্টগ্রাম শহরের ৮ মাইল দূরে ফতেয়াবাদ রাজধানী স্থাপন করেন। সেখানে তার নামে নসরত শাহদিঘী (বড় দিঘী) এখনো তার স্মৃতি বহন করছে।

১১. গৌড়ে হোসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪১৩-১৭) ত্রিপুরায় রাজা ধর্ম মানিক্যের সাথে তুমুল যুদ্ধ হয়। ত্রিপুরা রাজ তার রাজ্যসীমা আরাকানের অভ্যন্তর পর্যন্ত নিয়ে যান। ধর্ম মানিক্যের মৃত্যুর পর সমগ্র চট্টগ্রাম এবং আরাকানের উত্তরাংশে হোসেন শাহীর কর্তৃত্ব সু-প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন পরাগল খান, আমির্জা খান প্রমুখ চট্টগ্রামের শাসক ছিলেন।

১২. ১৫২২ সালে মহারাজদেব মানিক্য পুনরায় চট্টগ্রাম দখল করেন। আরাকানিরা এত তাড়াতাড়ি পালালো যে, তারা তাদের অর্থ-সম্পদ নিয়ে যেতে পারেনি, ঐ সকল স্থানে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে যায়। পরে যখনই সুযোগ আসতো তারা এসে তা খনন করে নিয়ে যেতো। বর্তমানেও অনেক লোভাতুর মানুষকে তাদের রেখে যাওয়া গুপ্তধন খুঁজতে দেখা যায় এবং এদের প্রতারণার ফাঁদে অনেকে সর্বশান্ত হয়ে যায়। ত্রিপুরা রাজ দু'বছরও অধিকার অক্ষুন্ন রাখতে পারেনি। সুলতান নসরত শাহ (১৫১৯-৩৩) ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র চট্টগ্রাম দখল করে নেন। তিনি চট্টগ্রামের নাম রাখেন ফতেয়াবাদ। ১৫১৭ সালে চট্টগ্রামে পর্তুগীজদের আগমন ঘটে। ১৫৩৮ সালে শের শাহের সেনাপতি কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয় হয়। ১৫৩৮-৮০ পর্যন্ত চট্টগ্রামে আরাকানীদের শাসন চলে। কিন্তু এ শাসন কোন ক্রমেই অনুক্রমিক ছিল না। চট্টগ্রামে মুসলমানদের প্রধান প্রতিদ্বন্দী ছিল ত্রিপুরা রাজ ও আরাকান রাজ। এক পর্যায়ে চট্টগ্রামের দখল নিয়ে ত্রিপুরা রাজ ও আরাকান রাজের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হলে ত্রিপুরা রাজ চিরদিনের জন্য চট্টগ্রাম হতে বিতাড়িত হন এবং ১৫৮১-১৬৬৬ সাল পর্যন্ত এখানে আরাকানী শাসন চলে। মোগলগণ বাংলায় শাসন ক্ষমতা আয়ত্বে রাখলেও বার বার চট্টগ্রাম দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরিশেষে ভ্রাতৃসংঘাতে পরাজিত শাহ সূজা আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলার তাড়া খেয়ে আরাকানে আশ্রয় নিলে আরাকান রাজ বিশ্বাসঘাতকতা করে শাহ সূজাকে সপরিবারে হত্যা করে। ভ্রাতৃশোকার্ত মর্মাহত আওরঙ্গজেব ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ঢাকার মোঘল সুবেদার শায়েস্তা খাঁকে নির্দেশ দেন। সম্রাটের নির্দেশে শায়েস্তা খান স্বীয় পুত্র বুজর্গ উমেদ খানকে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে নৌ সেনাসহ আরাকানীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। উমেদ খান

আরাকানী ও পর্তুগীজদের দ্বন্দের সুযোগে কৌশলে পর্তুগীজদের দলে ভিড়িয়ে তাঁর নৌশক্তি বৃদ্ধি ঘটান এবং উমেদ খানের নৌ সেনাধ্যক্ষ ইবনে হুসাইন কর্ণফুলী নদীর মোহনায় আরাকানীদের উপর তীব্র আক্রমণ চালিয়ে বিধ্বস্ত করে দেন এবং মোগলদের হাতে আরাকানীদের বিখ্যাত চাঁটিগাঁ দূর্গের (আন্দরকিল্লা) পতন ঘটে। এইভাবে চট্টগ্রামে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সম্রাটের নির্দেশে চট্টগ্রামের নাম রাখলেন ইসলামাবাদ যা ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে ১৫ ফেব্রুয়ারি মীর কাসিম কর্তৃক চট্টগ্রাম ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়া পর্যন্ত অব্যহত ছিল। ১৬৬৬-১৭১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রধানতঃ হাজারী মনসবদারদের হাতেই চট্টগ্রামের ফৌজদার নিযুক্ত হতেন। কিন্তু ১৭১০ খ্রিস্টাব্দ হতে ফৌজদারদের পরিবর্তে নায়েবরাই চট্টগ্রাম শাসন করতেন। এর পর আরাকানীরা কয়েকবার চট্টগ্রাম উদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

তথ্যসূত্র :

১। সৈয়দ সুলাইমান নদভী : আরবোঁ কি জাহাজরানী

২। ইবনে খুরদাদবিহ : কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক, পৃ.১৬৫

৩। সুলাইমান ইবনে আহমদ : সিলসিলাতুত তাওয়ারিখ, পৃ.৭৫

৪। মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী : মাসিক তরজুমানুল কুরআন।

৫। এ.কে.এম মুহিউদ্দীন : চট্টগ্রামে ইসলাম, পৃ.২৭-২৮

৬। হামীদুল্লাহ খান : তারীখ-ই-হামীদ-১৮৫৩, কলকাতা

৭। ড. আব্দুল করীম : চট্টগ্রামে ইসলামী ঐতিহ্য

৮। ওহিদুল আলম : চট্টগ্রামের ইতিহাস

৯।অধ্যাপক খালেদ সম্পাদিত : হাজার বছরের চট্টগ্রাম,

১০।ড. আব্দুল করীম : চট্টগ্রামে ইসলাম, পৃ.৩৬।

১১। মাহবুবুল আলম : চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানো আমল, পৃ.৮৭-৮৯

১২। তাফসিরে মাআরেফুল কোরআন - সুরা কামার এর তাফসির

১৩।সুখময় মুখপধ্যায় : বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, পৃ.৮

১৪। আর-রাহিকুল মাখতুম-সফীউর রহমান আল-মুবারকপূরী

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৪৫২

*****